নবীন

সপ্তদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

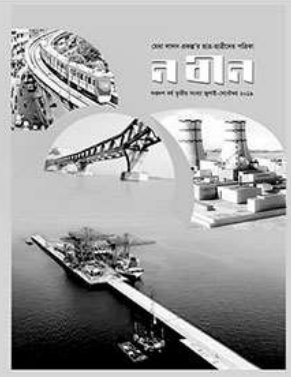

সূচিপত্র

এলো বরষা ২
বাংলাদেশের নদ-নদী ৩
সংকট সামলে হালদাপাড়ের হাসি ৭
জলবায়ু পরিবর্তন : কীভাবে লবণাক্ততা মোকাবেলা করছেন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা? ৯
অংকুর ১১
আত্মহত্যা প্রতিরোধ ১২
পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের জন্য করণীয় ১৪
স্বপ্ন দেখাচ্ছে ৯ মেগা প্রকল্প ১৬
অংকুর : নৈতিকতা উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা ১৮
মাইক্রোসফটের মিনি শহর ২১
বিসিএস প্রস্তুতি ২৪
রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ডা. মাহবুবর রহমানের কিছু পরামর্শ ২৬
সুস্থতার জন্য চাই আনন্দময় জীবনযাপন ও নিয়মানুবর্তিতা ২৮
প্রকল্প সংসবাদ ২৯
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ৩০
প্রকল্প সংবাদ ৩১
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩২

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

প্রকৃতি রুষ্ট রূপ দেখালেও কাগজে-কলমে এলো ঋতুরানি বর্ষা। তীব্র গরমে ক্ষণিকের আকাশবারি প্রকৃতিতে এনেছে সবুজের আবহ। ফুটেছে বর্ষারানি কদম। ফলে ফলে ভরে উঠেছে গাছ।

রিমঝিম রিমঝিম ঘন দেয়া বরষে/কাজরি নাচিয়া চল, পুর-নারী হরষে/কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে/কুহু পাপিয়া ময়ুর বোলে/মনের বনের মুকুল খোলে/নট-শ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বর্ষায় প্রকৃতি ও প্রাণীকুলে পরিবর্তনে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন এমনটি।

আর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষার রূপ-ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন–'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান,/ আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান,/মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে,/ এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান।'

রবি ঠাকুরের এ গানে বৃষ্টি আর কদম যেন দুজন দুজনের চিরদিনের মিতা। একজন আরেকজনের শুভেচ্ছাদূত।

বাদল দিনে প্রথম কদম ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক পঞ্জিকার হিসেবে ১৫ জুন পহেলা আষাঢ়। মানে বর্ষা ঋতুর প্রথম দিন। আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল অর্থাৎ বর্ষা ঋতু। এ ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য বৃষ্টি ঝরা আকাশ, কর্দমাক্ত মাঠ, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা পানিতে পরিপূর্ণ হওয়া ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরম–আম, জাম, কাঁঠাল পাকার সময়। জ্যৈষ্ঠের দমফাটা গরম যেমন অস্বস্তিকর তার বিপরীতে আছে বাহারি ফলের সমাহারে মনভোলানো প্রকৃতি। এসময়টায় বাজারে প্রায় সব ধরনের ফল পাওয়া যায়। কবির ভাষায় 'পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ'। জ্যৈষ্ঠের মধুমাস পেরিয়ে গাছে গাছে কদম ফুল ফোটে। জানিয়ে দেয় আষাঢ় আসছে। রুদ্র গ্রীষ্মের দাবদাহন শেষে প্রকৃতির রানি চিরসুন্দর শ্যামলী বর্ষার আগমন ঘটে। কিন্তু এবছর বৃষ্টির তেমন কোনো দেখা নেই। গরম পড়ছে অবিরাম। সবাই যেন মন প্রাণ উজাড় করে সৃষ্টিকর্তার কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে।

'বর্ষার দূত' কদম ফুল এরই মধ্যে ফুটতে শুরু করেছে। বর্ষার রূপ-ঐশ্বর্যে মুগ্ধ অনেক কবিই বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন। বর্ষা ঋতু তার বৈশিষ্ট্যের কারণেই স্বতন্ত্র।

প্রকৃতিতে ফুল ও ফলের সমাহার নিয়ে বর্ষা আসে। বাহারি ফুলের সুবাসে মুখরিত হয় প্রকৃতি। ফুলে ফুলে শোভিত হয় চারপাশ।

বর্ষা মানেই কর্দমাক্ত রাস্তা আর গাঁয়ের দস্যি ছেলেদের কদম ফুলকে ঘিরে হৈ হুল্লোড়। বর্ষাকে স্বাগত জানাতে এরই মধ্যে কদম ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রকৃতি। ঋতুচক্রের আবর্তনে অনেক আগেই কদম ফুল জানান দিয়েছে আষাঢ়ের আগমন বার্তা। তৃষ্ণায় কাতর বৃক্ষরাজি বর্ষার অঝোর ধারায় ফিরে পাবে প্রাণের স্পন্দন।

বর্ষা মানেই যেনো বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল। বৃষ্টির সঙ্গে কদমের ভালোবাসা খুবই নিবিড়। শুধু তাই নয়, প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশাল অংশজুড়েও রয়েছে কদমের পঙ্‌ক্তিমালা। তবে, নাগরিক উঠোনে সেই কদমের ঘ্রাণ, এখন অনেকটাই যেনো অতীত। নেই আর আগের মতো বিত্ত-বৈভব।

কদম ছাড়াও বর্ষায় ফোটা ফুলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বকুল, কলমি ফুল, স্পাইডার লিলি, দোলনচাঁপা, সুখদর্শন, ঘাসফুল, শাপলা, সন্ধ্যামালতি, কামিনী, গুল নার্গিস, দোপাটি, অলকানন্দ।

'আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেবো মেপে। লেবুর পাতায় করমচা, ঝড়-বৃষ্টি ঝরে যা।' ছোটবেলায় এই ছড়া আমরা অনেকেই কেটেছি। কিন্তু এখনো অনেকেই হয়তো সেই করমচা ফলটাই দেখিনি। যদিও বর্তমান সময়ে ওষুধি এই ফলটি দেশের অনেক এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে।

বর্ষার ফল করমচা। বৃষ্টিভেজা করমচা ফল, পাতা ও গাছ দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর। এখন দেশের বাজারগুলোতে বর্ষার এই ফলটি বিক্রি হচ্ছে।

বর্ষাকালের ফলগুলো পুষ্টিগুণে ভরা থাকে। পেয়ারা, লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেউয়া, কামরাঙা, কাউ, গাব ইত্যাদি বর্ষার ফল।

নানামুখী সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের পাশাপাশি বর্ষায় কিছুটা বিপদের ঝুঁকিও রয়েছে। ভারি বর্ষণ বা পাহাড়ি ঢলে ভেসে যেতে পারে গ্রামের পর গ্রাম। তৈরি হতে পারে নদী ভাঙন। ভেসে যেতে পারে বেড়িবাঁধ, মাছের ঘের। সে কারণে বন্যাপ্রবণ সমতল এলাকার মানুষ আতঙ্কে পার করে বর্ষাকাল। শুধু তাই নয়, অথৈ জলের তোড়ে তলিয়ে যেতে পারে কৃষকের আবাদি ফসলের জমিটি। আবার অতিবৃষ্টির কারণে শহুরে নাগরিকের রয়েছে জলাবদ্ধতার শিকার হওয়ার ঝামেলা। কিছু বিপদের কথা বাদ দিলে সব মিলিয়েই ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বর্ষা নিয়ে আসে স্বস্তি ও শান্তির অনুভূতি। ফুলে ফলে কিংবা বৃক্ষজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অপরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য।

মাহবুবুর রহমান মুন্না

বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৪ জুন ২০১৯

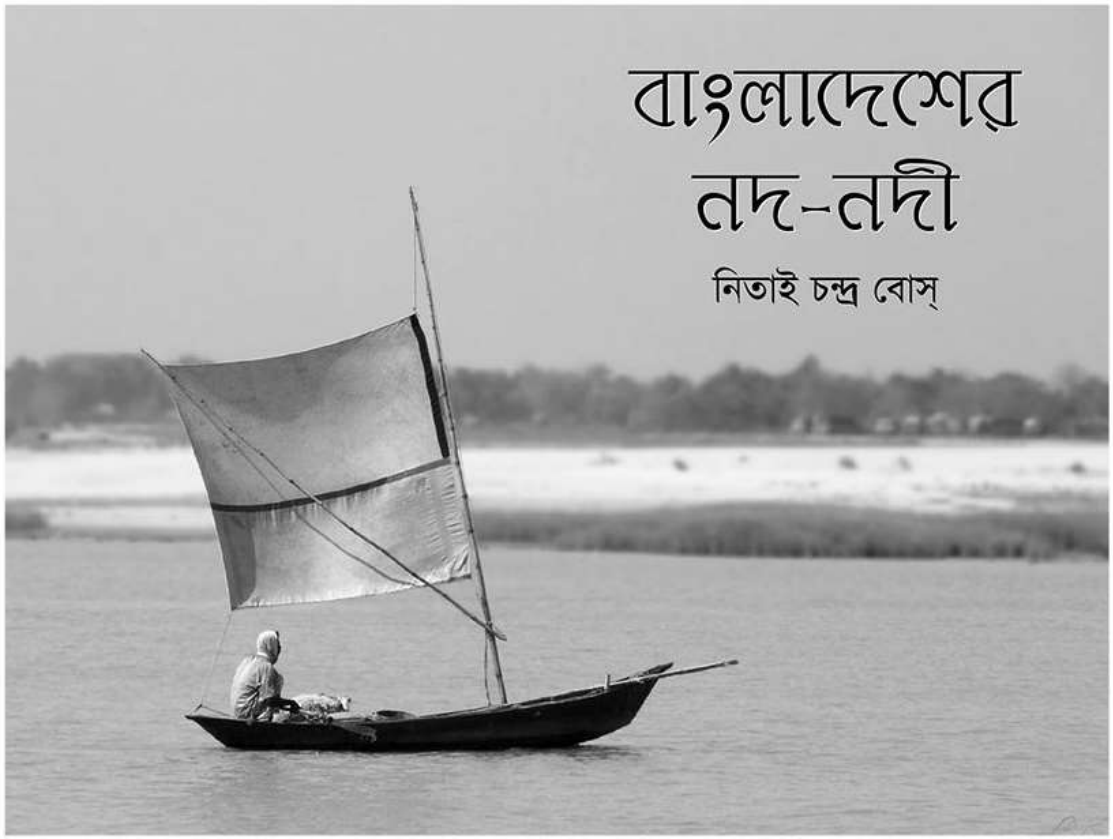

বাংলাদেশের নদ-নদী

নিতাই চন্দ্র বোস্

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত দেশসমূহের একটি। উত্তরের বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, উত্তর ভারতবর্ষের প্রধান নদ-নদীর উৎসস্থল। হিমালয় থেকে উৎসারিত প্রধান কয়েকটি নদী ও তার শাখা প্রশাখায় নাব্য সুবৃহৎ বদ্বীপই হলো আজকের বাংলাদেশ। বলা হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ বাংলাদেশ। এই দেশ মূলত নদীমাতৃক। ছড়ায়, গাঁথায়, কিংবদন্তী আর বাংলার বর্ণাঢ্য লোকসংস্কৃতিতে যে ছবি আমরা পাই তার মধ্যে নদীর রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসিয়ে যে বাংলাদেশকে দেখেনি, সে এ দেশ দেখেনি। মনসার ভাসান অথবা চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা থেকে শুরু করে জসীম উদদীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' অবধি দেখা যায় নদীর সচিত্র উপস্থিতি। এবং বাংলাদেশের সংগীত ঐতিহ্যেও বড় স্থান জুড়ে আছে নদ নদীর গান।

হিমালয়ের মানস সরোবরে যে গঙ্গার উৎপত্তি তা বাংলাদেশে প্রবেশ করে হয়েছে পদ্মা। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত এই গঙ্গা-পদ্মার ধারাকে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড বলা চলে। দেশের প্রায় আর সব নদীই এই গঙ্গা বা পদ্মার হয় উপনদী না হয় শাখা নদী। বাহাদুরাবাদ ঘাটের যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রকে পদ্মার উপনদী বলা চলে। পদ্মা-মেঘনার পশ্চিমের শাখা প্রশাখাসহ নদ-নদীর গতিপথ পূর্ব দক্ষিণে এবং পূর্বপারের নদীগুলি পশ্চিম-দক্ষিণে প্রবাহিত।

গঙ্গা : মানস সরোবরে উৎপত্তির পর উত্তর ভারতের হরিদ্বারে গঙ্গা সমতলভূমিতে নেমে আসে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের কাছে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করে। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর উৎসমুখের পর থেকে গঙ্গা পদ্মা নামে ৮০/৯০ মাইল পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের সীমানা নির্দেশ করে কুষ্টিয়ার উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গোয়ালন্দের কাছে, যমুনার সঙ্গে মিশে মিলিতধারা পদ্মা নামেই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। মেঘনা নামেই মিলিত স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তা প্রবল বন্যায় তার পুরান খাত ত্যাগ করে ব্রহ্মপুত্র খাতে পড়তে শুরু করে এবং গোয়ালন্দের অপর পারে যমুনার খাতে বইতে শুরু করে। এই মিলিত জলের আঘাত পদ্মাকে আস্তে আস্তে আড়িয়াল খাঁ বা ভুবনেশ্বর খাত তৈরিতে সাহায্য করে। নিম্নাংশে পদ্মা আজও পরিবর্তনশীল।

ভৈরব : ভাগীরথীর উৎসুখের ২৬/৩০ মাইল ভাটিতে পদ্মা থেকে ভৈরবের জন্ম। দশম শতক পর্যন্ত গঙ্গার প্রধান জলধারা, ভৈরব দিয়ে প্রবাহিত হতো। ভারতের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা হয়ে ভৈরব নদী বাংলাদেশের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নড়াইল জেলায় প্রবেশ করে খুলনা শহরের নিচে দিয়ে পূর্বদিকে বাগেরহাট শহর অতিক্রম করে বলেশ্বরী নদীতে গড়েছে। এই বলেশ্বরী গড়াই মধুমতির নিম্নাংশ, সাগর সঙ্গমে এর নাম হরিনঘাটা। কোনো কোনো মানচিত্রে ভৈরবকে মাথাভাঙ্গার শাখা হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভৈরবের শাখা নদীগুলো হলো কপোতাক্ষ, চিত্রা, বেত্রবতী ও পশুর।

পূর্বে ভৈরব ছিল বিশালকায় নদ। খ্রিস্টপূর্ব কয়েকশত বছর পূর্বে এরই তীরে গড়ে উঠেছিল গঙ্গারিদ্ধি সভ্যতা। মেগাস্থেনিস ৩শ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ও মিশরের টলেমি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান খুলনা জেলায় গঙ্গারিদ্ধি রাজ্যের ও বন্দরের অবস্থানের উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন গঙ্গারিদ্ধি বন্দর আজকের বাগেরহাটের সন্নিকটবর্তী ছিল।

মধ্যবঙ্গের প্রাচীন সভ্যতা ভৈরবের তীরেই গড়ে উঠেছিল। যশোরে ভৈরব-তীরে এই সময় বড় বড় জাহাজ তৈরি হতো। মোগল আমলে পুরোনো কসবা নামে এ অঞ্চল পরিচিত ছিল এবং নবাবী আমলে যশোরের ত্রিমোহিনীতে একটি কেল্লা ছিল। বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে কালীন্দি ও যমুনার মধ্যভূমিতে।

ভৈবর, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী মজে যাওয়ার কারণ হিসেবে ভূগোলবিদরা বলেন যে হিমালয়ের নেপাল অধিত্যকায় হিমবাহে উৎপন্ন নদীগুলো বিপুল জলরাশির সঙ্গে প্রবল বেগে পাথর, কাঁকর, মোটাদানার বালি ইত্যাদি বয়ে এনে ভৈরব, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার বিপরীত পারে মিশেছিল। প্রতি বছর ঐ নদীগুলোর বন্যাপ্রবাহ গঙ্গা-প্রবাহকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিত।

ভৈরব, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতির উৎসমুখে পাথর জমে উঁচু হতে থাকে আর পানির প্রবাহ কমতে থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষীণকায় পদ্মা স্ফীত হয়ে ওঠে আর প্রবলবেগে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ঘটে দশম শতকের শেষভাগ ও একাদশ শতকের প্রারম্ভে।

পশুর : ভৈরবের শাখা। মংলা বন্দর পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। মুখ্যত জোয়ারভাটা আর মাটির ভেতর দিয়ে চোয়ান পানির ওপর নির্ভর করে ভৈরব, পশুর, শিবসা প্রভৃতি নদীগুলি বেঁচে আছে। ভৈরব যশোরের বসুন্দিয়া বাজার পর্যন্ত নাব্য। জোয়ারের সময় দরাজহাই বা ছাতিয়ানতলা পর্যন্ত ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে।

মাথাভাঙ্গা : কুষ্টিয়া জেলার উত্তর পশ্চিমে জলাঙ্গী উৎসমুখের দশমাইল ভাটিতে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বেরিয়ে মাথাভাঙ্গা মেহেরপুর জেলার ভেতর দিয়ে এসে জদুখালি ঘাটে ভৈরবে মিশেছে। মাথাভাঙ্গার প্রধান প্রবাহ ইছামতি দিয়ে প্রবাহিত হতো। বর্তমানে মাথাভাঙ্গার খাত মজা। বছরের অধিকাংশ সময়ই পানি থাকে না। রাজশাহীর কয়েক মাইল পূর্বে মাথাভাঙ্গার উৎপত্তিস্থলের নিচে পদ্মায় 'নদিয়া ব্যারেজ' বাঁধ পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এ বাঁধ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও ভৈরব প্রভৃতি নদ-নদীর খাত ও প্রবাহের উন্নতি সাধন করা।

ইছামতি : ইছামতির উৎপত্তি মাথাভাঙ্গা ভৈরবের সঙ্গমস্থলের নিচে চুয়াডাঙ্গা জেলায়। দর্শনায় কেরু কোম্পানির চিনিকলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে বসিরহাট মহকুমার পূর্ব সীমানা ধরে ইছামতি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই মোহনার নাম রায়মঙ্গল এবং এখানেই দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ জেগেছে। পদ্মার লেকে মাথাভাঙ্গা-ইছামতি মোটামুটি ভারত-বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করছে।

বেত্রবতী : বেত্রবতী বা বেতনা নদী ঝিনাইদহ উপজেলায় ভৈরব থেকে উদ্ভব হয়ে সাতক্ষীরা অতিক্রম করে কপোতাক্ষ নদে গিয়ে মিশেছে।

কপোতাক্ষ : এরও উদ্ভব ভৈরব থেকে। যশোর শহরের পশ্চিমে চৌবাহার সন্নিকট থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে কপোতাক্ষ প্রবাহিত। বঙ্গোপসাগরে পতিত হবার আগে ঝিকরগাছা শহরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলা, সাতক্ষীরার কলারোয়া ও তালা উপজেলা হয়ে খুলনার পাইকগাছার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত।

চিত্রা : মেহেরপুরে ভৈরব থেকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চিত্রা নদী এঁকেবেঁকে দক্ষিণে গাজীরচাই গিয়ে চাঁড়াভিটা নদীতে মিশেছে। ঘোড়াখালিতে নবগঙ্গার সঙ্গে চিত্রা সংযুক্ত। মাগুরায় বেগবতী বা ব্যাং নদী চিত্রায় পড়েছে। ১৭৬৪-৬৯ খ্রিস্টাব্দের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকৃত বস্তুত ম্যাপে চিত্রার গতিপথটি দেখানো আছে। বাড়াখালিতে নীলকুঠি ছিল। চিত্রা থেকে বেরিয়ে ভৈরব পর্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম কাজল। অনেকেটা কাটা খাল।

নবগঙ্গা : এ নদী কুষ্টিয়া জেলায় মাথাভাঙ্গা থেকে বেরিয়ে চুয়াডাঙ্গা শহরের দক্ষিণ দিয়ে এসে ঝিনাইদহ শহরের মধ্য দিয়ে মাগুরা শহরের উত্তর কোণে কুমার নদের সঙ্গে মিলেছে। লোহাগড়া বাজারের উত্তর দিয়ে ভাটিয়াপাড়ার বিপরীতে ছিল নবগঙ্গা। কিন্তু লোহাগড়া থেকে মধুমতি পর্যন্ত খাতটির কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। নবগঙ্গার তীরেই বড়দিয়া নদীবন্দর। ইংরেজ আমলের বড়দিয়া থেকে পূর্বদিকে মধুমতি অবধি হ্যালিফেক্স-খাল কাটা হয় মূলত চলাচলের পথ সংক্ষেপ ও সুগম করার জন্য। এখন এ খাল প্রশস্ততা ও গভীরতায় বিরাট। নবগঙ্গা নদী মৃত।

কুমার : কুষ্টিয়ার নবগঙ্গার উৎসমুখের পূর্বে মাথাভাঙ্গা থেকে কুমার নদীর উৎপত্তি। এ নদী চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ পেরিয়ে শহরের নবগঙ্গায় পড়েছে।

মাগুরায় মধুমতির অপর পারে ফরিদপুর জেলায় মধুমতি থেকে একটি নদী বের হয়ে ফরিদপুরের মধ্য দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে মাদারিপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীতে মিশেছে। এর নামও কুমার নদী। হয়ত গড়াই-মধুমতি সৃষ্টির আগে এটাই ছিল কুমারের প্রবাহমান খাত।

গড়াই-মধুমতি : পদ্মার শাখা নদী গড়াই মধুমতির উৎপত্তি কুষ্টিয়া শহরের উপকণ্ঠে। ফরিদপুর জেলার পশ্চিম সীমানা ধরে দক্ষিণে প্রবাহিত এ নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হবার পূর্বে নড়াইল,

লোহাগড়া, গোপালগঞ্জ হয়ে বাগেরহাটের পূর্বে ও পিরোজপুর-বরগুনায় পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। উৎসমুখ থেকে মাগুরার উত্তর সীমানায় প্রবেশ পথ পর্যন্ত এর নাম গড়াই বা গৌরী। তারপর গোপালগঞ্জ পর্যন্ত অংশ মধুমতি। বাগেরহাটের মোল্লারহাট থেকে কচুয়া পর্যন্ত অসংখ্য বাঁকের কারণে নদীর নাম হয়েছে আঠারবাঁক। পিরোজপুর বরগুনা সীমানা পর্যন্ত বলেশ্বরী আর পরের অংশের নাম হরিণঘাটা।

সুন্দরবনে নদীর গতি-প্রকৃতি : সুন্দরবন প্রধানত ভাগীরথী-হুগলার মোহনা থেকে হরিণঘাটা পর্যন্ত বিস্তৃত। বনের ভেতর অসংখ্য নদীনালা প্রবাহিত। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হলো—কালীন্দি, শিবসা, পশুর, মংলা ইত্যাদি।

সুন্দরবন অঞ্চল এক সময় সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মাটি ধসে বনের একটি বড় অংশ বসে যায়। ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের কারণে সুন্দরবনের বসতি ধ্বংস হয়েছে। তার ওপর রয়েছে লবণাক্ততা বৃদ্ধি আর সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মগফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উপদ্রব। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ আমলে পুনর্বসতি পরিকল্পনায় নতুন বসতি শুরু হয়।

উত্তরবঙ্গ-বরেন্দ্রভূমির নদ-নদী : উত্তরবঙ্গে গঙ্গা-যমুনার দোয়ার অঞ্চলে বরেন্দ্রভূমি অবস্থিত। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া নদী বরেন্দ্রভূমির সীমা নির্দেশ করে। সমস্ত অঞ্চলটি পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা নদীর দ্বারা চারটি ভাগে বিভক্ত। এর পূর্ব দিককার তিনটি অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত।

মহানন্দা : হিমালয়ে উৎপত্তি হওয়ার পর নেপাল থেকে বের হয়ে ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জে প্রবেশ করে। গোদাগাড়ী ঘাটের কাছে মহানন্দা গঙ্গায় পড়েছে। বাংলাদেশে এ নদী পদ্মার উপনদী। বাংলাদেশের উত্তরে শেষ সীমান্ত বিন্দু তেঁতুলিয়া এবং পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষীরূপে এ নদী এখনও বহমান।

পুনর্ভবা : হিমালয় থেকে বের হয়ে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পঞ্চগড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে পুনরায় পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার মধ্যে দিয়ে আবার বাংলাদেশে ঢুকে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে রোহনপুরের কাছে মহানন্দায় মিলেছে।

আত্রাই : উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদীগুলির একটি হলো আত্রাই। এর উৎপত্তি হিমালয়ে, পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে পঞ্চগড় জেলায় প্রবেশ করেছে। পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ হয়ে পরে ঠাকুরগাঁও জেলার উত্তরপূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর জেলার ভেতর দিয়ে দক্ষিণে আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। পরে বাংলাদেশের নওগাঁ রাজশাহী ও নাটোর হয়ে পাবনা জেলার ভেতর দিয়ে যমুনায় পড়েছে।

করতোয়া : হিমালয়ে করতোয়া নদীর উৎপত্তি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা অতিক্রম করে সিরাজগঞ্জ জেলায় শাহাজাদপুরের পাশ দিয়ে হুরাসাগর নদীতে

পড়ে যমুনায় মিশেছে। মহাস্থানগড় ও বগুড়া শহর করতোয়ার তীরে অবস্থিত।

ইছামতি : পাবনা জেলার ভেতর পদ্মা-যমুনা সংযোগকারী এ নদী এমন মৃত। একসময় পাবনা শহরের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হতো। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইছামতির প্রচুর উল্লেখ রয়েছে।

তিস্তা : তিস্তা নদী হিমালয়ে জন্মে সিকিম অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় সমভূমিতে নেমেছে। পরে বাংলাদেশে নীলফামারী জেলায় প্রবেশ করেছে। রংপুরের উত্তর সীমানা ধরে প্রবাহিত হয়ে গাইবান্ধার ভেতর দিয়ে জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাটে ব্রহ্মপুত্র-তিস্তার মিলিত স্রোতধারা যমুনা নামে গোয়ালন্দের অপর পারে পদ্মায় পড়েছে।

ভূগোলবিশারদদের মতে বিহারের কুশী নদী এক সময় উত্তরবঙ্গে আত্রেয়ীর সঙ্গে মিশত। এই কুশী-আত্রেয়ী-তিস্তার মিলিত প্রবাহ পদ্মায় পড়ত। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল বন্যায় তিস্তা খাত পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছিল এবং তার পরেই ব্রহ্মপুত্র যমুনা খাতটি গ্রহণ করে।

ধরলা : ভুটান থেকে বের হয়ে কুচবিহারের মধ্য দিয়ে ধরলা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

পূর্বাঞ্চলের নদ-নদী

ব্রহ্মপুত্র : এ নদের উৎস তিব্বতের মানস সরোবরে। তিব্বতে এর নাম সান-পো। ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ভিতর দিয়ে এসে সান-পো দিহাং আসামের দিবাং নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোতধারার নাম ব্রহ্মপুত্র। দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাহাদুরাবাদ ঘাটে তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজারে মেঘনায় পড়েছে একটি, এরই নাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের আগে এটাই ছিল ব্রহ্মপুত্রের মূল গতিপথ।

ধলেশ্বরী : টাঙ্গাইল জেলায় যমুনা থেকে এর উৎপত্তি। মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার ভেতর দিয়ে নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিশেছে। বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর শাখা নদী। ঢাকা শহর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি ধলেশ্বরীতেই পড়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদী

সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি জেলার ছোট বড় পাহাড় ও খাসিয়া গারো লুসাই পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ নিয়ে এ অঞ্চল।

সুরমা : মেঘালয়ের খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বৃষ্টির জলে সুরমার উৎপত্তি। মেঘালয় দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। সুনামগঞ্জের মধ্য দিয়ে হবিগঞ্জের উত্তর সীমানায় প্রবাহিত কালনি নদীতে গিয়ে মিশেছে।

কুশিয়ারা : নাগা ও মনিপুর জেলা বিভক্তিকর বরাক নদী সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়। তার একটি মাকা আসামের শিলচর দিয়ে বদরপুরে কুশিয়ারা নামে বিয়ানীবাজারের দক্ষিণ দিয়ে

মৌলভীবাজারের কাছে মনু নদীর মোহনায় পরে কালনি নাম ধারণ করে। কালনি অগ্রসর হয়ে সুরমার সাথে মিলিত হয়েছে।

বরাক : হবিগঞ্জের ভিতর দিয়ে এসে লাখাই এর কাছে বরাক কালনি নদীর সাথে মিলেছে।

মেঘনা : সুরমা, কুশিয়ারা ও বরাকের মিলিত স্রোতধারার নাম মেঘনা। চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি নদী

কর্ণফুলী : মিজোরামের লুসাই পর্বতে উৎপন্ন হয়ে কর্ণফুলী নদী রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরাসরি বঙ্গোসাগরে পড়েছে। কাপ্তাইয়ে একে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এরই সাগর মোহনায় অবস্থিত।

সাংগু : আরাকান পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি হয়ে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

মাতামুহুরী : লুসাই পাহাড় থেকে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মহেশখালি খালের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

নাফ : বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ সীমা বরাবর প্রবাহিত হয়ে নাফ নদী ব্রহ্মদেশ ও টেকনাফের সীমানা নির্দেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

এই হলো বাংলাদেশের নদ-নদীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নদীবহুল-বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের অনেক নদীই তার নাব্যতা হারিয়েছে। অনেক নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ব-দ্বীপের দক্ষিণ দিকের নদীগুলো সমুদ্রের জোয়ারের জলে সজীব। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ও বিংশ শতকে রেল ও রাস্তা তৈরির স্বার্থে অনেক নদী অববাহিকায় বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। নদী মরেছে ও নাব্যতা হারিয়েছে, পুরোনো গঞ্জ ধ্বংস হয়েছে।

নবীন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যা থেকে নেওয়া

সংকট সামলে হালদাপাড়ের হাসি

মোহাম্মাদ রুহুল আমীন

প্রতিবছর স্থানীয় লোকজন উৎসবমুখর পরিবেশে রুই-জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এই নদী থেকে। ডিম আহরণের এই রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। প্রতিবছর এপ্রিল থেকে জুন মাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পরিবেশে মা মাছ প্রচুর পরিমাণ ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার বিশেষ সময়কে 'তিথি' বলা হয়ে থাকে, যা স্থানীয় লোকজনের কাছে 'জো' নামে পরিচিত।

কার্প-জাতীয় মাছের (রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউশ) অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নের পাহাড়ি গ্রাম সালদা থেকেই হালদা নামের উৎপত্তি। সালদা গ্রামের সৃষ্ট হালদাছড়া মানিকছড়ি খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথমে হালদা খাল এবং পরে ফটিকছড়ির ধুরং খালের সঙ্গে মিলিত হয়ে হালদা নদীতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ হালদা নদী চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান ও হাটহাজারী উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

প্রতিবছর স্থানীয় লোকজন উৎসবমুখর পরিবেশে রুই-জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এই নদী থেকে। ডিম আহরণের এই রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। প্রতিবছর এপ্রিল থেকে জুন মাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পরিবেশে মা মাছ প্রচুর পরিমাণ ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার বিশেষ সময়কে 'তিথি' বলা হয়ে থাকে, যা স্থানীয় লোকজনের কাছে 'জো' নামে পরিচিত। এই জোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাত হতে হবে। এই বৃষ্টিপাত শুধু স্থানীয়ভাবে হলে হবে না, নদীর উজানেও হতে হবে। প্রবল বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলের পানি অত্যন্ত ঘোলা ও খরস্রোতা

হয়ে ফেনা আকারে প্রবাহিত হয়। জোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য জোয়ার-ভাটার জন্য অপেক্ষা করা। পূর্ণ জোয়ারের শেষে অথবা পূর্ণ ভাটার শেষে পানি যখন স্থির হয়, তখনই কেবল মা মাছ ডিম ছাড়ে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ডিম সংগ্রহকারীরা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিম সংগ্রহের জন্য জাল, নৌকা ও অন্য সরঞ্জামাদিসহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ না থাকায় প্রজনন মৌসুম শেষ হতে চললেও কাঙ্ক্ষিত ডিমের দেখা মেলেনি, ফলে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হতে থাকে। এর মধ্যে ঘটে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। গত ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রেলসড়কের সেতু ভেঙে তেলবাহী একটি ওয়াগন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় মরাছড়ায় পতিত হয়। প্রতিটি ওয়াগনে ফার্নেস তেল ছিল প্রায় ২৫ হাজার লিটার। মুহূর্তেই বেশির ভাগ তেল ছড়িয়ে পড়ে, যার শেষ গন্তব্য ছিল হালদা নদী। হালদাদূষণ রোধ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ত্বরিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ফার্নেস তেলের ছড়িয়ে পড়া রোধে আড়াই কিলোমিটার খালের মধ্যে ১২টি বাঁধ নির্মাণ করে পাঁচ দিন টানা কাজ কওে প্রায় শতভাগ তেল অপসারণ করে স্থানীয় প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রাণান্তকর চেষ্টায় হালদা নদী ভয়াবহ দূষণ থেকে রক্ষা পায়।

মা মাছ শিকার ও বালু উত্তোলন বন্ধ করার লক্ষ্যে দিনরাত চলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। আট মাসের ৫৬টি অভিযানে দেড় লক্ষাধিক মিটার জাল জব্দ করা হয়, বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত ড্রেজার এবং ইঞ্জিনচালিত নৌকা ধ্বংস করা হয় দেড় ডজন। হালদা গবেষক এবং ডিম সংগ্রহকারীদের মতে, প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই বছর হ্যাচারিগুলোয় ডিম পরিস্ফুটনের কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। হাটহাজারী অংশের তিনটি হ্যাচারির প্রায় ৭০ ভাগ কুয়াই (সিস্টার্ন) প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিত্যক্ত ছিল। ডিম ছাড়ার প্রায় দুই মাস আগেই শতভাগ কুয়া ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলে উপজেলা প্রশাসন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটে, গত ২৫ মে সকালে অল্প কিছু নমুনা ছেড়ে রাত থেকে পূর্ণ মাত্রায় ডিম ছাড়তে শুরু করে মা মাছ। ডিম সংগ্রহ করতে নদীতে নামে ২৩০টি নৌকা। রাত থেকে পরদিন সকাল নয়টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে ডিম সংগ্রহের যজ্ঞ। হ্যাচারি ও মাটির কুয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, এবার প্রায় ১০ হাজার কেজি ডিম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় ডিমের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও বিগত ১০ বছরের পরিসংখ্যান বিবেচনায় এই পরিমাণ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

২.

ডিম সংগ্রহ শেষে স্থানীয়ভাবে তৈরি ১৪১টি মাটির কুয়া ও ১৩১টি হ্যাচারির কুয়ায় শুরু হয় ডিম পরিস্ফুটনের কাজ। চার দিন পরিচর্যার পর উৎপাদিত রেণু বিক্রির উপযোগী হয়। মৎস্যখামারিরা চার দিন বয়সী এসব রেণু প্রথমে নার্সারি পুকুরে পরিচর্যা করে পরবর্তী সময়ে পুকুরে কিংবা জলাধারে ছাড়েন। শুরুতে বিগত বছরগুলোর ডেটা বিশ্লেষণে এবার রেণু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১১৭ কেজি। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ দিন সরেজমিন ডেটা সংগ্রহের পরে প্রায় ২০০ কেজি রেণু উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়। লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও প্রায় ৮০ কেজি বেশি রেণু উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৬৪ লাখ টাকা (প্রতি কেজি ৮০ হাজার টাকা হারে)। রেণু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ডিম কম পাওয়ার আক্ষেপ অনেকাংশে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। সরেজমিন হ্যাচারি পরিদর্শনে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। গত বছর ২২ হাজার ৬৮০ কেজি ডিম থেকে রেণু পাওয়া গিয়েছিল ৩৭৮ কেজি। অন্যদিকে, এই বছর ১০ হাজার কেজি ডিম থেকে রেণু মিলেছে ২০০ কেজি। ডিম সংগ্রহকারীদের মতে, এই বছর ডিম নষ্ট হয়নি বলেই রেণু উৎপাদনের হার বেশি। গত বছরের তুলনায় এই বছর ডিম ফুটানোর সরকারি কুয়ার সংখ্যা দেড় গুণ বেশি।

কুয়া কম থাকায় গত বছর নির্ধারিত পরিমাণের তিন গুণ বেশি ডিম একটা কুয়াতে ডিম সংগ্রহকারীরা ফুটানোর চেষ্টা করেছেন, ফলে অনেক ডিম নষ্ট হয়েছে। এবার ডিম আহরণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি কুয়ায় ডিমের পরিমাণ চার বালতি (৪০ কেজি) নির্ধারণ করে দেয় উপজেলা প্রশাসন। ফলে, ডিম নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি ছিল না। গত সেপ্টেম্ব থেকে শুরু হয় প্রশাসনের নিবিড় তদারকি। মা মাছ শিকার ও বালু উত্তোলন বন্ধ করার লক্ষ্যে দিনরাত চলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। আট মাসের ৫৬টি অভিযানে দেড় লক্ষাধিক মিটার জাল জব্দ করা হয়, বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত ড্রেজার এবং ইঞ্জিনচালিত নৌকা ধ্বংস করা হয় দেড় ডজন। হালদা গবেষক এবং ডিম সংগ্রহকারীদের মতে, প্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই বছর হ্যাচারিগুলোয় ডিম পরিস্ফুটনের কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। হাটহাজারী অংশের তিনটি হ্যাচারির প্রায় ৭০ ভাগ কুয়াই (সিস্টার্ন) প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিত্যক্ত ছিল। ডিম ছাড়ার প্রায় দুই মাস আগেই শতভাগ কুয়া ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলে উপজেলা প্রশাসন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়। সর্বোপরি ভয়াবহ তেল দূষণের হাত থেকে হালদা বাঁচাতে প্রশাসনের জান বাজি রাখা উদ্যোগ। হালদার প্রতি যথাযথ মনোযোগে ডিম আহরণকারীদের অতিরিক্ত আর্থিক প্রাপ্তি প্রায় ৬৪ লাখ টাকা আর পোনার সংখ্যা হিসাব করলে অতিরিক্ত পোনা প্রাপ্তি প্রায় দেড় কোটি (প্রতি কেজি রেণুতে আনুমানিক দুই লাখ পোনা থাকে)। স্বল্প অর্থ ব্যয় আর প্রশাসনের আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগ ডিম সংগ্রহকারীদের মুখে এনে দিয়েছে চওড়া হাসি। সেই হাসি অমলিন থাকুক মৌসুম থেকে মৌসুমে।

লেখক : উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রথম আলো ৯ জুন ২০১৯

জলবায়ু পরিবর্তন
কীভাবে লবণাক্ততা মোকাবেলা করছেন
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা?

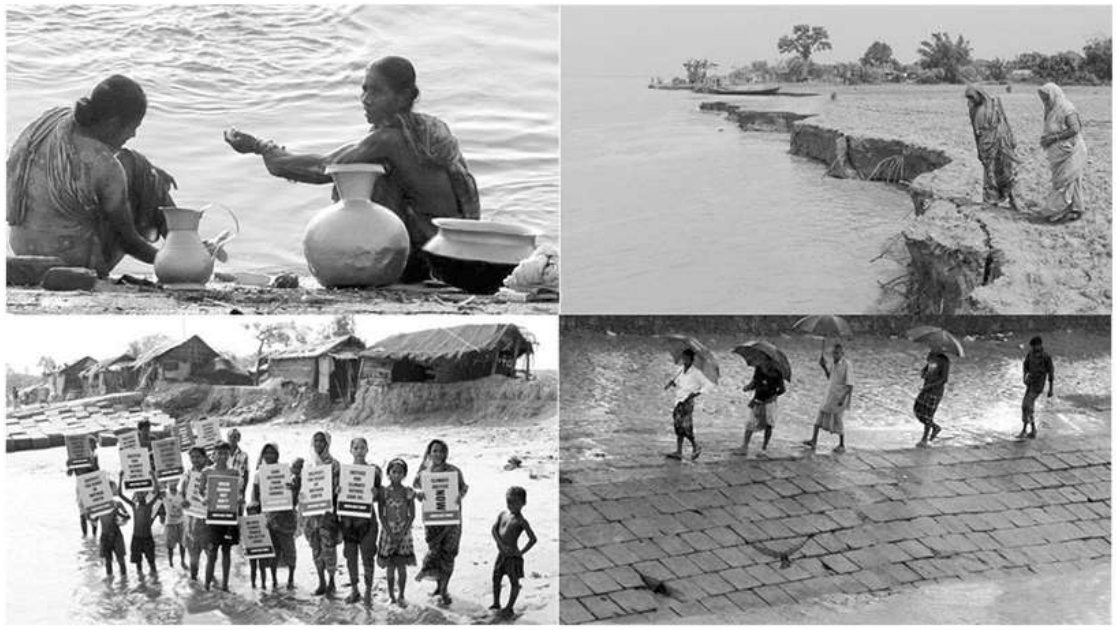

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল আইপিসিসি বলছে, এখনই যদি পৃথিবীর দেশগুলো এ নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ না নেয়–তাহলে পৃথিবীতে দুর্যোগ নেমে আসবে, সমুদ্রে পানির স্তর বেড়ে যাবে, সমুদ্রে পানির তাপমাত্রা এবং অম্লতা বেড়ে যাবে, ধান-গম-ভুট্টার মতো ফসল ফলানোর ক্ষমতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের উপকুলীয় জেলাগুলোয় পানিতে লবণাক্ততা ক্রমাগত বাড়ছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দৃশ্যমান প্রভাব হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় লবণাক্ততা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের বৃহত্তর খুলনা বরিশাল এবং ভোলার মতো জেলাগুলোয় লবণাক্ততা অনেক দিনের সমস্যা–কিন্তু এ অঞ্চলে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দৃশ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই লবণাক্ততা সম্প্রতি বাড়ছে, এবং তাতে এখানকার কৃষিতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হচ্ছে।

পোল্যান্ডের কাটোভিচ শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এখন মানবসভ্যতার প্রতি বিশ্বের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোর একটি।

'বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার উপকুলীয় জেলাগুলোর নিচু এলাকাসমূহ–সেখানে লোনা পানি ধরে যাচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য। সেখানে অনেকে লোনা পানি থেকে বাধ্য হচ্ছে, কৃষিতে পরিবর্তন হচ্ছে–যা আগে ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যই হচ্ছে এটা'–কাটোভিচ থেকে বলছিলেন, পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. সালিমুল হক।

তিনি বলছেন, ওই এলাকাগুলোতে এখন লোকেরা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন প্রজাতির ধান চাষ করছে, অনেকে ধান ছেড়ে চিংড়ি চাষ করছে, কোথাও বা বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হচ্ছে।

তার কথায়, পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার অনেক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

'কিন্তু মনে রাখতে হবে অ্যাডাপটেশনের একটা সীমা আছে। নোনা পানি আরো বেড়ে গেলে ওখানে আর লোক বাস করতে পারবে না'–বলেন ড. সালিমুল হক।

কীভাবে এই পরিবর্তন অনুভব করছেন ওই সব এলাকার লোকেরা?

কথা বলেছিলাম ভোলার চরফ্যাশনের একজন কৃষক মোহাম্মদ সোলায়মানের সাথে।

'এই এলাকায় ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকেই লোনা পানি ঢুকতে থাকে। বিশেষ করে যেসব জায়গায় বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে সেই এলাকাগুলোয় লবণাক্ততা বড় সমস্যা'–বলছিলেন তিনি।

তার মতে ঢালচর, চর কুকরিমুকরি, চর মাদ্রাজ, আসলামপুর–এরকম কয়েকটি ইউনিয়নে এ সমস্যা বেশি। গত চার-পাঁচ বছরে এ সমস্যা বেড়েছে বলেও জানান তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তন আর নদী-ভাঙন এ কারণেই লবণাক্ততা

লবণাক্ততার কারণে কীভাবে এলাকাগুলোতে কৃষির ধরন পাল্টে যাচ্ছে–এ প্রশ্ন করেছিলাম পটুয়াখালী জেলার সরকারি কৃষি কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ভুঁইয়াকে।

তিনি বলছিলেন, কলাপাড়া ও আমতলী উপজেলা দুটির কথা।

তিনি বলছিলেন, আগে যেখানে ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের পর লোনা পানি ঢুকত, এখন দেখা যাচ্ছে সময়টা এগিয়ে এসেছে–জানুয়ারির ১৫ তারিখের পর থেকেই আন্ধারমানিক নদীর খালগুলোতে লোনা পানি ঢুকতে থাকে। এর পাশাপাশি লোনা পানি আটকানোর অনেক বাঁধ-স্লুইস গেট ভেঙে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে মিঠা পানির অভাবে ওই এলাকায় বোরো চাষ করা যাচ্ছে না।

তিনি বলছিলেন, একসময় ৭০-৮০র দশকে এই এলাকায় সরকারি কৃষি বিভাগের ৮০০-র বেশি পাম্প কাজ করত, কিন্তু এখন কাজ করে মাত্র ৬০-৭০টি। এতেই বোঝা যায়, কীভাবে বোরো চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন চাষীরা।

তিনি বলেন, অনেকে ওই সময়টায় ধানের পরিবর্তে তরমুজ চাষ করছেন।

সরকারের কৃষি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মি. ভুঁইয়ার মতে, বৃষ্টিপাতের সময়ও বদলে যাচ্ছে। আগের মত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বর্ষাকাল শুরু হচ্ছে না। বৃষ্টি হচ্ছে ভাদ্র মাস নাগাদ।

'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এখন বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ে উঠছে'

জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর বিজ্ঞানীদের তথ্য-উপাত্ত বা একাডেমিক গবেষণার পর্যায়ে নেই। এর প্রতিক্রিয়া এখন একেবারে বাস্তব, সবাই চোখে দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে পারছেন।

অনেক আগেই বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর আবহাওয়া চরম-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে।

গত কয়েক বছরের সংবাদমাধ্যমের খবর দেখলে অনেকেরই মনে হবে: সেই দিন হয়তো এসে গেছে।

পৃথিবীর কোথাও এখন অস্বাভাবিক গরম পড়ছে, কোথাও অস্বাভাবিক ঠান্ডা পড়ছে, কোথাও বন্যা, কোথাও বছরের পর বছর ধরে খরা হচ্ছে, কোথাও আবার ঘন ঘন দাবানল সৃষ্টি হচ্ছে। নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এসব খবর।

ড. সালিমুল হক বলছেন, গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এগুলো হচ্ছে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বলছে, প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় ২০১৮ সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি বেশি। ২০১৫ থেকে প্রতি বছরই পৃথিবীর উষ্ণতম বছরের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

ড. সালিমুল হক বলছেন, আবহাওয়ায় যে চরম প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণেই ঘটছে।

বিজ্ঞানীদের মতে এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল আইপিসিসি বলছে, এখনই যদি পৃথিবীর দেশগুলো এ নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ না নেয়–তাহলে পৃথিবীতে দুর্যোগ নেমে আসবে, সমুদ্রে পানির স্তর বেড়ে যাবে, সমুদ্রে পানির তাপমাত্রা এবং অম্লতা বেড়ে যাবে, ধান-গম-ভুট্টার মতো ফসল ফলানোর ক্ষমতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন এমনভাবে বাড়ছে যে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখার যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছিল তাতে আর কাজ হচ্ছে না।

এখন অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বড় হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

bbc.com ৪ ডিসেম্বর ২০১৮

ফাগুনের গান

তাপস কুমার কয়াল
সদস্য-ক/৮৬

এই ফাগুনের কৃষ্ণচূড়া রক্তে তাদের রাঙা
ও ভাই, আজো যাদের ঘুম ভাঙেনি,
তাদের সে ঘুম ভাঙা।

আজ নতুন করে শপথ নেবার দিন
আমার মায়ের মুখের ভাষা করব না বিলীন
মোরা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আনব চেতনা।

এই বাংলার মাঠে মাঠে সোনা ছড়ানো
জীবন ভর হবে নাকো সবটা কুড়ানো
মোরা বাংলা মায়ের অলঙ্কারেই সাজাব তার গা।

নবীন প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যা থেকে নেওয়া

ঢাকা

মো. মোস্তফা কামাল
সদস্য: ৩৮১/২০০০

যেদিকে চোখ যায় শুধু দালান আর দালান,
তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আমি এক ছোট ইনসান।
নাহি তরু নাহি লতা, দিগন্ত আকাশ দিয়ে ঘেরা,
যদি কারো শখ থাকে, হয়তো ছুঁয়ে পাবে হাত দিয়ে তারা।
রাস্তায় ঠাসা জ্যাম, কাকেদের আছে প্রেম,
ফুটপাতে আছে মানুষের মিছিল,
মশাদের ভিড় আছে, ময়লার স্তুপ আছে,
বাসের চাপায় যায় কারো কারো দিল।
বিশুদ্ধ বায়ু নাই, শিয়ালের ডাক নাই,
শুধু যেন খেয়ে বেঁচে থাকা,
তারপরও কেন জানি–ভালো লাগে
এই তিলোত্তমা ঢাকা।

মা অথবা ঈশ্বর প্রদত্ত দূত

প্রত্যাশা সরকার
সদস্য : ১২০৮/২০১৬

ছোটবেলায় যখন বাবা মারা গেল, চারপাশ থেকে সব কথা ছাপিয়ে একটা কথাই আসতে লাগল। এখন এই বিধবা মহিলা চার মেয়ে নিয়ে কই যাবে?

তখন না বুঝলেও এখন ঠিকই বুঝতে পারি একজন 'বিধবা'কে সহানুভূতি জানানোর আড়ালে সবাই বুঝিয়ে দিতে চায় তোমার জন্য সহজ জীবন না, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাশা তুমি ছেড়ে দাও!

কিন্তু আমার মাকে কি এসব ছোঁয়নি? যদিও জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে অনেক কাঁদতে দেখেছি মাকে। কিন্তু আমাদের সামনে কখনও ভেঙে পড়েনি মা। নতুন করে সব করেছে। অবাক হয়ে যাই যখন দেখি কোনো সাপোর্ট ছাড়া একা এতটা পথ হেঁটে এসেছে আর তার মেয়েদের জন্য শান-বাঁধানো রাস্তা রচনা করেছে সামনে এগোনোর জন্য। আমার জীবনে প্রথম সাফল্য আসে যখন পিএসসিতে থানা ফার্স্ট হই, তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার প্রত্যেক সাফল্যের পেছনে তাকালে আমার মা ছাড়া আর কাউকে দেখি না। তার ত্যাগের মূল্য কি কখনও দেওয়া সম্ভব?

মাঝেমধ্যে ভাবি, মা হয়তো আমার মা না। ঈশ্বর প্রদত্ত কোনো দূত; যিনি এসেছেন আমাদের এত সুন্দর জীবন উপহার দিতে। হয়তো শুধু আমার মা না, প্রত্যেকটা সুখি মানুষের মা-ই ঈশ্বর প্রদত্ত দূত। ভালোবাসি আমার মা কে। আর শুভ কামনা জানাই লড়াই করে আসা প্রত্যেকটা মা-কে যার সামনে সাজানো ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধ

হামিদা আখতার বেগম

মৃত্যু মানুষের জীবনে ধ্রুব সত্য। 'জন্মিলে মরিতে হইবে'–শিশুকাল থেকে একথা যেমন জেনেছি, তেমনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি–'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে'। তবু এ সুন্দর পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয় সৃষ্টির অমোঘ বিধানেই। কিন্তু কিছু মানুষ নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি নিজেই ঘটায়। মনে প্রশ্ন জাগে–কেন? এমন মানসিকতা কিভাবে সৃষ্টি হয়? কেন মানুষ আত্মহত্যা করে?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এ পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ তার জীবনাবসান ঘটাচ্ছে স্বেচ্ছায়। এ হিসাব বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার। এ সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে আট লক্ষ মানুষ জীবনাবসান ঘটায় আত্মহত্যার মাধ্যমে। কি ভয়ংকর তথ্য–কিন্তু এটাই প্রকৃত সত্য। আত্মহত্যার ঘটনা জীবনের যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে, তবে বেশিরভাগ আত্মহত্যা ঘটে অল্প বয়সে–১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সে। বাংলাদেশও এ হিসাবের বাইরে নয়। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশের নির্ভুল তথ্য না পাওয়া গেলেও আমরা বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে জানতে পাই শুধুমাত্র ২০১১ সালেই ১৯,৬৯৭ জন আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করেছে। স্থানীয় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে ১১,০৯৫ জন আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতাল ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মধ্যে ১২৮টি আত্মহত্যা ঘটে থাকে। এদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। ২০১০ সালের এক গবেষণা তথ্য অনুযায়ী আত্মহত্যাকারীদের ৮৯% মহিলা (শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ২০১০)। সমাজে নারীর অবমুল্যায়ন ও নারীর প্রতি সহিংস আচরণকেই এই সংখ্যাধিক্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি)।

বলাবাহুল্য, প্রকাশিত পরিসংখ্যানের বাইরেও আরও অনেক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার খবর আমরা জানি না। তা ছাড়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এমন সংখ্যাও কম নয়। এসব ঘটনা সমাজে মানুষের মানসিক বিপর্যয়ের প্রমাণ বহন করে। কেবলমাত্র যে বা যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তারা নয়, সেইসাথে কতশত পরিবার ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে–মানসিকভাবে বিপন্ন হচ্ছে সেটাও লক্ষ করা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর দশ কোটি আশি লক্ষ মানুষের জীভন বিপন্ন, বিধ্বস্ত হচ্ছে এই আত্মহত্যা নামক মারণব্যাধির কারণে। তাই সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন আসে–কিভাবে নিবারণ করব, কিভাবে প্রতিরোধ করব এই ভয়ংকর আত্মহননকে? জাতীয় পর্যায়ে–নাকি ব্যক্তি পর্যায়ে? প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক ব্যক্তি এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং করা অবশ্য কর্তব্য। কখনও গবেষক হিসাবে আত্মহত্যার কারণ ও আত্মহননকারীর মানসিকতা ও পরিস্থিতিমূলক উপাদান সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে, কখনও সমাজের সাধারণ মানুষ হিসাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, কখনও বা মানসিক স্বাস্থ্য প্রফেশনাল হিসাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টার মাধ্যমে, তাদের বন্ধু হয়ে, ভরসার পাত্র হয়ে আত্মহনন প্রচেষ্টাকে রুখে দাঁড়াতে পারি আমরা। কাছের মানুষের আত্মহত্যার কারণে যারা বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারব কি ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে আত্মহত্যা প্রতিরোধের কর্মসূচি গড়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে তেমন কোনো কর্মসূচি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। সারা বিশ্বে মাত্র ৩৫টি দেশে এ ধরনের আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা যায়। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশে জাতীয় পর্যায়ে আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করাকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৩-২০২০ বাস্তবায়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ২০২০ সাল নাগাদ আমরা ১০% আত্মহত্যা কমিয়ে আনব। জাতিসংঘের Sustainable Development Goal (SDG) এর অন্যতম লক্ষ্য আত্মহত্যার মাত্রা হ্রাসকরণ–আর সেজন্যেই অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সরকারকে এ বিষয়ে কালক্ষেপন না করে উদ্যোগ নিতে হবে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পথে অনেক বাধা রয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক, আইনগত এবং ধর্মীয় বাধা অন্যতম। এগুলো সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করে এগিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ইসলামিক বা শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত প্রায় ২০টি দেশে আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকারীদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থাৎ আত্মহত্যাকে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে দেখা হয়। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে প্রথমে আইনের সংস্কার করতে হবে। আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত না করতে পারলে কোনো প্রতিরোধ কর্মসূচি কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। সামাজিক পর্যায়েও আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দেহের অসুখ বা সমস্যা হলে যেমন রোগ নিরাময় ও নিবারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তেমনি মনের সমস্যা হলেও তার নিবারণ ব্যবস্থা রয়েছে–এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। তবেই আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি সফল হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচিতে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে'র (১০ই অক্টোবর) পাশাপাশি 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস'ও পালিত হয় প্রতি বছর ১০ই সেপ্টেম্বর। 'Working together to prevent suicide' অর্থাৎ 'আত্মহত্যা প্রতিরোধকল্পে একসাথে কাজ করা' এ দিবসের লক্ষ্য। এ বছর (২০১৯) এই দুই আন্তর্জাতিক দিবস একইসাথে আত্মহত্যা প্রতিরোধের সংকল্প (Theme) গ্রহণ করেছে। তাই আমরা আশা করব সরকার, গবেষক, সমাজসংস্কারক, আইনবিদ ও সাধারণ জনগণ একযোগে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম বিষয় 'আত্মহত্যা প্রতিরোধ' কল্পে কাজ করে যাবে। কারণ, এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষেই আত্মহত্যার মতো জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য। তাই এ বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে আমাদের নিজ নিজ অঙ্গনে নিজ নিজ কাজ নিষ্ঠার সাথে করে যেতে হবে। তাহলেই আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মপ্রয়াস সফল হবে–টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) অন্যতম লক্ষ্য (Goal) অর্জিত হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

1. National Institute of Mental Health, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
2. Psychiatric Unit (outdoor), Dhaka Medical College Hospital, Dhaka-1000
3. Psychiatric Unit (outdoor), Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Shahbagh, Dhaka- 1000
4. Psychiatric Unit (outdoor), Sir Salimullah Medical College, Mitford Road, Dhaka-1100
5. Child Developmental Centre (CDC), Sir Salimullah Medical College Hospital, Mitford, Dhaka-1100
6. Child Development Centre (CDC), Shishu Hospital, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
7. Institute of Pediatric Neuro-disorder and Autism (IPNA), Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Shahbagh, Dhaka-1000
8. National Trauma Counseling Centre, 37/3 Eskaton Garden Road (MohilaBishoyakOdhidaptarBhabon), Dhaka 1000. Phone: 02-8321825, 01713177175. E-mail: ntccbd@yahoo.com
9. Psycho-social Counseling Unit, Ain o Shalish Kendra, 7/17 Block B, Lalmatia, Dhaka-1207. Phone: 02-8100192, 02-8100195, 02-8100197. E-mail: psh@askbd.org
10. Psychological Service Centre, Department of Educational and Counseling Psychology, Dhaka University Arts Building, Dhaka-1000
11. Nasirullah Psychotherapy Unit (NPU), Department of Clinical Psychology, Dhaka University Arts Building, Dhaka-1000. E-mail: clipsy.npu.du@gmail.com
12. Psychological Assessment Clinic, Department of Clinical Psychology, Dhaka University Arts Building, Dhaka-1000. Phone: 01996783758
13. Bangladesh Protibondhi Foundation (BPF), 6, Borobag, Mirpur-2, Dhaka-1216. Phone: 02-9010976,01726851582. E-mail: bpfkal@yahoo.com
14. Prio CREA, 312, BaitulAman Housing Society, Road, Adabor, Dhaka -1207, Phone: 01724979415. E-mail: info@creasociety.org
15. Centre for Mental Health and Care, Bangladesh (CMHC,B), 78/2 New Airport Road, Tejkunipara, Tejgaon. Phone: 01974349569. E-mail: cmhcbd2015@gmail.com
16. Monobikash Psychotherapy and Counseling Centre. 36, Green Super market, Green Road, Dhaka-1215. Phone: 02-9136469, 01675558339. E-mail: monobikash.bd@gmail.com
17. Sajida Foundation Psycho-center Counseling Center. House 92, Road 23, Block A, Banani, Dhaka. Phone: 02-55035433. E-mail: pcc@sajidafoundation.org
18. Healing Heart Counseling Centre. House 121,Road 6, Block B, Basundhara residential Area, Dhaka 1229. Phone: 01622929397, 01752074497. E-mail: healingheartbd@gmail.com
19. Mon Psychotherapy and Counseling Centre. 145/1, Cresent Plaza, Green Road, Dhaka-1205. Phone: 01764441166, 01742544000
20. Psychiatric Unit, Apollo Hospital, Dhaka. Basundhara Residential Area, Plot 81, Block E, Dhaka-1229
21. OPD (Counseling Centre), United Hospital. Plot 15, Road 71, Gulshan 2, Dhaka 1212. E-mail: info@uhlbd.com

লেখক : প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আইইউবিএটি ও পূর্বতন অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের জন্য করণীয়

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই জীবনধারণের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরিবার ও সমাজে তারা অবহেলিত। পুষ্টিকর খাদ্য, চিকিৎসা সুবিধা, নাগরিক সুবিধা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত তারা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'The Journey to Age Equality'; বাংলায় যাকে বলা হয়েছে 'বয়সের সমতার পথে যাত্রা'। সম্ভবত এর মানে দাঁড়ায় প্রবীণদের দূরে না রেখে সব বয়সের মানুষের সঙ্গে সমযাত্রা।

অর্থাৎ প্রবীণদের যেন সমাজে আলাদা চোখে দেখা না হয়। সবার সঙ্গে যেন সমানভাবে সমান উদ্যমে চলতে পারে এবং সে মর্যাদাটুকু যাতে প্রবীণরা পায়। মানবজীবনের স্বাভাবিক গতি প্রবাহে অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য সময় হচ্ছে বার্ধক্য।

কোনো মানুষই চায় না তার জীবনে বার্ধক্য আসুক। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। আজ যে নবীন, সময়ের বিবর্তনে কাল তাকে প্রবীণ হতেই হবে। কিন্তু এ অমোঘ বাস্তবতাকে অনেকে স্বীকার করে নিতে চায় না। আর চায় না বলেই পরিবার ও সমাজে প্রবীণরা আজ অপাঙক্তেয় বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। মাথাপিছু আয় বাড়ছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নের ফলে আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রবীণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম না থাকায় এ দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক সমস্যায় প্রতিনিয়ত ভুগছেন।

বিশ্বে ৬০ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটির বেশি এবং ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। জনসংখ্যাবহুল বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় দ্রুততম গতিতে বাড়ছে।

বাংলাদেশে প্রবীণের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লাখ বলা হলেও বাস্তবে এ সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করা হয়। আমাদের এ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই জীবনধারণের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরিবার ও সমাজে তারা অবহেলিত। পুষ্টিকর খাদ্য, চিকিৎসা সুবিধা, নাগরিক সুবিধা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত তারা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন।

এক সমীক্ষায় জানা যায়, পারিবারিক সহায়তা, পেনশন ও বয়স্ক ভাতার আওতাধীন প্রবীণ ছাড়াও এ দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী অযত্ন-অবহেলার শিকার। এ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।

ফলে অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অধিকাংশ প্রবীণের কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ায় পরিবারের সন্তান বা অন্য সদস্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন।

যারা সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের জীবন কাটাতে হয়। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না। অনেক সময় পছন্দের খাবার খেতে ইচ্ছা করলেও লজ্জায় মুখে কিছু বলতে পারেন না।

এই যে মানসিক কষ্ট, এটা অনেক পরিবারের সদস্য বুঝতে চেষ্টা করেন না বা করলেও না বোঝার ভান করে এড়িয়ে যান, যা প্রবীণদের মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবীণদের মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা নবীনরা বুঝতে চায় না।

তারা বুঝতে চায় না, পরিবার ও সমাজকে তারা অনেক কিছু দিয়েছে। আজ তারা দিতে পারছে না বলে তাদের অবহেলা বা অনাদর করার কোনো সুযোগ নেই। এ অবস্থায় তাদেরও একদিন আসতে হবে–এ বাস্তবতাকে তারা আমলে নেয় না। আর নেয় না বলেই প্রবীণরা পরিবার ও সমাজে অবহেলার শিকার হচ্ছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এ বন্ধনগুলো ধীরে ধীরে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রবীণরা আরও বেশি একাকিত্বের যন্ত্রণা ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন।

বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য; তা অধিকাংশ সন্তানই পালন করেন না। সন্তানরা তাদের অবস্থান ধরে রাখতে না পারার কারণে ছেলের বউরাও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি অন্যায় আচরণ করেন এবং অবহেলার চোখে দেখেন।

এ দৃশ্য আমাদের সমাজে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ বের করতে হবে। তা না হলে পরিবার ও সমাজে প্রবীণরা আরও বেশি নিগৃহীত ও নির্যাতনের শিকার হবেন।

এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ জাপানে প্রবীণদের আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। এ প্রবণতা যাতে আমাদের মাঝে বিস্তৃত না হয়, সেদিকে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীসহ সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের চারপাশে প্রবীণদের নিয়ে কিছু কিছু ঘটনা মনটাকে বিক্ষিপ্ত এবং অনেক ভারি করে তোলে।

গত মার্চ মাসে দিনাজপুরের বিরামপুরের ইউএনও প্রবীণদের নিয়ে একটি গণশুনানির আয়োজন করেছিলেন। যেখানে একটি ইউনিয়নের ২৫ বৃদ্ধ নারী ও ৪ জন পুরুষ অংশ নেন; যারা সবাই ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত।

এসব বৃদ্ধ নারীর প্রায় সবাই যে অভিযোগটি করেছেন তা হলো, সন্তানরা তাদের অবহেলা করে। পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব তারা নেয়নি; ফলে জীবন-জীবিকার তাগিদে এসব বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে।

এত গেল দরিদ্র ও কৃষক শ্রেণির মানুষের কথা। আমাদের সমাজে অনেক মধ্যবিত্ত ও ধনিক পরিবারের সন্তানরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন না বা বাবা-মাকে দেখভাল করেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে নিঃসঙ্গ পরিবেশে জীবনের বাকি সময় কাটাতে হয়।

আমাদের পারিবারিক বন্ধন দিন দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এটি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতি, স্মার্টফোন আসক্তি ইত্যাদি কারণে আধুনিক প্রজন্ম পিতামাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবিক গুণাবলিগুলো লোপ পেতে বসেছে। উল্লেখ্য, দেশে যে কয়টি বৃদ্ধাশ্রম আছে; সেখানে অবস্থানরত অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং এদের অনেকের সন্তান দেশের বাইরে অবস্থান করায় এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখভাল না করার কারণে অনন্যোপায় হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

অনেকের কাছেই শুনতে হয়েছে, সন্তানদের অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন তারা নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে বাবা-মায়ের দেখভাল করতে পারেন না। এসব অকৃতজ্ঞ সন্তান একবারও ভাবে না তাদের কাছ থেকে তাদের সন্তানরা কী শিক্ষা পাচ্ছে?

এ সন্তানরা একদিন বড় হয়ে তাদেরও অবহেলা-অনাদর করতে পারে। তাদের ঠিকানাও একদিন বৃদ্ধাশ্রম হবে, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের অবহেলা যেমন অমার্জনীয়, তেমনি দণ্ডনীয় অপরাধ। ২০১৩ সালে পিতামাতার ভরণপোষণ আইনটি পাস হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তানকে তাদের পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ভরণপোষণ বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদানকে বোঝানো হয়েছে। এ আইনে সন্তান বলতে সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র-কন্যা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে, 'পিতামাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতামাতার একই সঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

কোনো সন্তান তাহার পিতা বা মাতাকে বা উভয়কে তাহার বা ক্ষেত্রমতো, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধনিবাস বা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদাভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করিবে না।'

কিন্তু এ আইন সম্পর্কে কজন সন্তান জানে বা মানে। আমাদের দেশে অনেক আইন আছে; কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। এ ব্যাপারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আইনের বিধিবিধানগুলোর যথাযথ প্রয়োগ হলে পরিবার ও সমাজে প্রবীণরা কিছুটা হলেও স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারবেন। আমরা আশা করব, উন্নত বিশ্বের মতো সরকার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ব্যাংক, বীমা, গণপরিবহন, হাসপাতাল-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাধ্যতামূলক করবে; আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে এটাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা।

মনজু আরা বেগম
লেখক ও গবেষক; সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বিসিক
দৈনিক যুগান্তর ১ অক্টোবর ২০১৯

স্বপ্ন দেখাচ্ছে ৯ মেগা প্রকল্প

৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত পদ্মা বহুমুখী সেতু সম্পন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে শতকরা ১ দশমকি ২ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এছাড়া প্রতি বছর শতকরা ০ দশমকি ৮৪ হারে দারিদ্র্য কমবে। গত জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো সেতুর কাজ এগিয়েছে ৬৩ শতাংশ। এর মধ্যে মূল সেতুর ৭৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৫০ শতাংশ। আর মূল সেতু ও নদী শাসনের জন্য পরার্মশক কাজ শেষ হয়েছে ৭৭ শতাংশ।

পদ্মা বহুমুখী সেতু : ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই সেতু সম্পন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে শতকরা ১ দশমকি ২ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এছাড়া প্রতি বছর শতকরা ০ দশমকি ৮৪ হারে দারিদ্র্য কমবে। গত জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো সেতুর কাজ এগিয়েছে ৬৩ শতাংশ। এর মধ্যে মূল সেতুর ৭৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৫০ শতাংশ। আর মূল সেতু ও নদী শাসনের জন্য পরার্মশক কাজ শেষ হয়েছে ৭৭ শতাংশ।

এদিকে ২০২০ সালরে ডিসেম্বের এই সেতু দিয়ে যান চলাচল করার বিষয়ে সরকার আশাবাদী। এরই মধ্যে ৯টি স্প্যান বসানোর মাধ্যমে সেতুর ১৩৫০ মিটার (১ দশমিক ৩৫ কিলোমিটার) দৃশ্যমান হয়েছে। মোট ৩৩টি স্প্যানের ওপর গড়ে উঠবে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু।

পদ্মা রলেসেতু : পদ্মা সেতু চালুর দিন থেকেই এর ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচলের জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সেতুর রেলসংযোগ প্রকল্পের কাজ। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে রেলসংযোগের কাজ। ২০১৬ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদনের পর দুই বছর লেগেছে প্রকল্পের অর্থায়ন নিশ্চিত করতে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথের নির্মাণ কাজ গত অক্টোবরে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রেলওয়ের তথ্য মতে, ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি শেষ হবে ২০২৪ সালের জুনে। গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পে অগ্রগতি ১৬ দশমিক ২ শতাংশ। বর্তমানে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।

মেট্রোরেল : দুই ধাপে চলছে উত্তরা-মতিঝিল মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ। ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন ৬-এর আওতায় ২০২৪ সালের মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উত্তরা-আগারগাঁও অংশটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে, আগারগাঁও-মতিঝিল অংশটি ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরা-মতিঝিল মেট্রোরেল প্রকল্পের অগ্রগতি ২১ দশমকি ৫ শতাংশ।

চলতি বছরের ডিসেম্বরে দুই ধাপে চলা এ প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ শেষ হবে। প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরা-আগারগাঁও অংশের ৩৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

এদিকে সব মিলিয়ে রাজধানীর প্রায় ২২ কিলোমিটার সড়কে এখন প্রকল্পের কাজ দৃশ্যমান। কাজ শেষ হলে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন সম্ভব হবে বিদ্যুৎ চালিত এই ট্রেনে। চলতি বছরের শেষেই দেখা যাবে রাজধানীতে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতি সম্পন্ন সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেন চলাচল।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : গত বছরের ৩০ নভেম্বর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের চুল্লির জন্য কংক্রিটের মূল স্থাপনা নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথম ইউনিট ২০২২ সালে এবং একই ক্ষমতার দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৩ সালে চালু হবে। এরই মধ্যে প্রকল্পের ২৭ ভাগ কাজের অগ্রগতি হয়েছে।

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : ভারতের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন রামপাল থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্প কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করবে। ২০০ কোটি ডলার অর্থায়নে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ ও ভারত।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করতে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) এবং বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইএফপিএল) এর মধ্যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার এই কেন্দ্র নির্মাণে প্রয়োজনীয় ১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করবে ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম থেকে ঘুমধুম রেলপথ নির্মাণ : ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-ঘুমধুম পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৩৫ কোটি টাকা।

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার রেললাইনের নির্মাণ কাজের প্রায় ২১ দশমিক ৫১ শতাংশ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার রেললাইনের নির্মাণ কাজ। আগামী ২০২২ সালের মধ্যেই এ প্রকল্পটি চালু হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পায়রা সমুদ্রবন্দর : ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর ১৬ একর জমির ওপর এই বন্দর স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নে রামনাবাদ নদীর পশ্চিম তীরে নির্মিত বন্দরটি ২০৩০ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনটি পর্বে এ কাজ সম্পন্ন হবে। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ১০০ থেকে দেড় হাজার কোটি মার্কিন ডলার।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর : ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেই কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ঘোষণা দেয়। তবে প্রকল্পটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

কক্সবাজারের সোনাদিয়ায় বন্দরটি নির্মাণের জন্য জাপানের পেসিফিক কনসালটেন্ট ইন্টারন্যাশনালের (পিসিআই) মাধ্যমে একটি টেকনো-ইকোনমিক স্ট্যাডি করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে (পিপিপি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও আগ্রহী বিনিয়োগকারী না পাওয়ায় গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট (জিটুজি) ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

অর্থায়নের বিষয়টি চূড়ান্ত হলেই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাতারবাড়ী আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার: কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে নির্মিত হচ্ছে ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুতকেন্দ্র।

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত (ফাস্ট ট্র্যাক) ১০ মেগা প্রকল্পের একটি। বিদ্যুতকেন্দ্রটি কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এর অধীনে নির্মাণ করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এ বিদ্যুতকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

মাতারবাড়ী ও ঢালঘাটা ইউনিয়নের এক হাজার ৪১৪ একর জমিতে কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে।

এ প্রকল্পে ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্টিম টারবাইন, সার্কুলেটিং কুলিং ওয়াটার স্টেশন স্থাপন, ২৭৫ মিটার উচ্চতার চিমনি ও পানি শোধন ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। আধুনকি প্রযুক্তির এই কেন্দ্রের কম পরমিাণ কয়লার প্রয়োজন হবে এবং কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে।

২০১৫ সালের আগস্টে মাতারবাড়ীতে বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণে ৩৬ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয় সরকার। এই প্রকল্পে ২৯ হাজার কোটি টাকা দেবে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা)। বাকি পাঁচ হাজার কোটি টাকা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে দেয়া হবে। অবশিষ্ট অর্থের যোগান দেবে কেন্দ্রটির বাস্তবায়নকারী ও স্বত্বাধিকারী সিপিজিসিবিএল। প্রকল্পের প্রায় ১৭ শতাংশ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে।

এস রাকিব

২৭ মার্চ ২০১৯, ডেইলি বাংলাদেশ ডটকম

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

নৈতিকতা উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা

মোছা. মনিরা পারভীন মনি
সদস্য : ১২৭৯/২০১৭

দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

[মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৮-'১৯ তে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ৩টি রচনা নবীন পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের সংখ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটির বাকি অংশ প্রকাশ করা হলো]

(গত সংখ্যার পর...)

২০. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিজে সচেতন হয়ে যুবকরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারে। অধিক জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে তারা জনগণের মধ্যে প্রচার প্রচারণা চালালে সহজেই তারা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কারণ শিক্ষিত যুব সমাজকেই সকলেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এতে করে বাড়তি জনসংখ্যার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে এবং জাতির উন্নয়ন হবে।

২১. **নৈতিক অবক্ষয় রোধ :** যুবসমাজের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে একটি ইতিবাচক জাগরণ সৃষ্টি হতে পারে। সমস্ত অন্যায়, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে যুবসমাজ। এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেরা সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ হয়ে উঠলে একটি দুর্নীতিমুক্ত জাতি গড়ে উঠতে পারে।

২২. **নিরক্ষতা দূরীকরণ :** জাতিকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে যুবসমাজ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একজন শিক্ষিত যুবক তার পাশের মানুষদের অক্ষর দান করতে পারে। প্রতিটি যুবক এই দায়িত্ব পালন করলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সহজ হবে। এতে জাতি উন্নতি লাভ করবে।

২৩. **বেকারত্ব নিরসন :** মেধা ও সৃজনশীলতা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুবসমাজ বেকারত্ব নিরসনে কাজ করতে পারে এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

২৪. **সমাজকল্যাণ :** দেশের যেকোনো দুর্যোগে যুবসমাজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করতে পারে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া যুবসমাজ যেকোনো দুর্ঘটনা এবং অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সমাজসেবায় ভূমিকা রাখতে পারে। এতে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয়।

২৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** দেশের কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুবসমাজ বিশাল অবদান রাখতে পারে। তারা কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে। তারা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা রপ্ত করে দেশে শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। তারা নিজেদের উদ্যোগে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা, হাঁস-মুরগি, পশু ও মৎস চাষ করে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করতে পারে। এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন হবে।

২৬. **সাংস্কৃতিক জাগরণ :** জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটিয়ে তারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। নাটক, সাহিত্য ও ক্রীড়াক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে সারা পৃথিবীতে জাতির সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে। এভাবে জাতির উন্নয়নে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২৭. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** জাতীয় অর্থনীতিতে যুবসমাজ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের যুবক-যুবতিরা দেশের বাইরে গিয়ে একদিকে যেমন দেশর চাকা সচল রাখছে তেমনি দেশ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে।

আজ জাতি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আমরা জাতিকে কি উপহার দিই? প্রত্যেক যুবকের আজ উচিত জাতিকে ভালো কিছু উপহার দেওয়া। আজ আমরা যুবক কিন্তু কিছু বছর পর আমরা থাকব না। কিন্তু আমরা জাতিকে কি উপহার দিয়ে গেলাম? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা আমাদের দেখে শিখবে। তাই আসুন আমরা সবাই দেশ ও জাতি গঠনে ভালো কিছু করার শপথ নিই।

ইভটিজিং প্রতিরোধে যুবসমাজের ভূমিকা : বর্তমানে ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। ইভটিজিং এর বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত আমাদের সমাজ। প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললেই ইভটিজিং এর কারণে বর্বরতা, নির্মম প্রাণহানী ও আত্মহননের খবর দেখা যায়। ইভটিজিং এর ফলে প্রতিদিনই কোনো না কোনো নারী হচ্ছে নিহত অথবা বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। সভ্য সমাজে এটা কারো কাম্য হতে পারে না। নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং খারাপ আচরণ বদলাতে হবে সবাইকে। সে জন্যই একদিকে কঠোর আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি

এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টি সামনে এসেছে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে আমাদের যুবসমাজ। এটিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে সমাজের সকল শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষেরই উচিত এর প্রতিবাদে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। রাস্তাঘাটে বখাটে-সন্ত্রাসীদের উত্ত্যক্ত ও হয়রানির শিকার হয়ে অনেক মেয়ের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধরণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। ইভটিজিং প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে যুবসমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। পারিবারিকভাবে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দান করতে হবে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৫ দফা, ১১ দফা হয়ে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান–সকল পর্যায়েই বঞ্চিত, নিপীড়িত জাতিকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে এদেশের যুবসমাজ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই দেশ বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ দেশের যুবসমাজ বারবার প্রমাণ করেছে 'আমরা হারিনি, আমরা পেরেছি, আমরা পারব।' যুগে যুগে যৌবন-দূত তরুণের দলই জরাগ্রস্ত পৃথিবীর বুকে এনেছে নবজীবনের ঢল। তিমির রাত্রির অবসানে রক্তরাঙা প্রভাতের বন্দনা করেছে। তরুণদের কণ্ঠেই গীত হয় নতুন দিনের গান। তাদের চোখেই থাকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যুবসমাজের করণীয় : বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অতীতে নবাগত প্রজন্ম তথা যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তরুণরা মেধাবী। তাদের দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ তুলনাহীন। তাদের মেধা সঠিক পথে পরিচালিত হলে তারা দেশের জন্য অনেক অবদান রাখতে পারে। আজকের নতুন প্রজন্ম তথা যুবসমাজ মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছে। পাঠ করেছে দেশের ইতিহাস। বই পুস্তক, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যুবসমাজ সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যুবসমাজকে কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার জন্য উৎসাহ, প্রেরণা দিতে হবে এবং সঠিক শিক্ষার ধারায় তাদের পরিচালিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যুবসমাজকে নৈতিকতার দিক দিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কেননা নৈতিকতার অবক্ষয় দেখা দিলে জাতি হিসেবে টিকে থাকা কঠিন। এ লক্ষ্যে নৈতিক শিক্ষার জন্য বর্তমান প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সুসঙ্গত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্বরান্বিত করতে হলে যুবসমাজকে অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তাকে জাগ্রত করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশ ও জাতি গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। তরুণ প্রজন্মকে ন্যায়নীতি সততায় এবং মহান স্বাধীনতার চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন এবং তরুণ যুবসমাজের ভূমিকা : তরুণ ও যুবসমাজের বহু মেধাবী ও সম্ভাবনাময় প্রতিভা মাদকের নেশার কবলে পড়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয়। যেহেতু মাদকাসক্তি ও নেশাজাতীয় দ্রব্য মানবসমাজের জন্য সর্বনাশ ও চিরতরে ধ্বংস ডেকে আনে, তাই মাদকাসক্তি প্রতিরোধে তরুণ যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। জনগণের সামাজিক আন্দোলন, গণসচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে এর প্রতিকার করা সম্ভব। পরিবারে পিতা-মাতা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ পাড়া, মহল্লা বা এলাকায় মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ঘৃণা প্রকাশের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা, উন্নত জীবন গঠন ও জীবনাচরণের শিক্ষা দিতে হবে।

মাদকাসক্তরা শুধু নিজেদের মেধা ও জীবনীশক্তিই ধ্বংস করছে না, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত করছে নানাভাবে। যেসব পরিবারের সদস্য নেশাগ্রস্ত, সেসব পরিচারের দুর্দশা অন্তহীন। জীবনধ্বংসী এ নেশার কবলে পড়ে অসংখ্য তরুণের সম্ভাবনাময় জীবন নিঃশেষিত হচ্ছে।

মাদক নিরাময়ে চাই পরিবারের আন্তরিকতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা। বাবা-মা যদি তাঁদের ব্যস্ত সময়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ সন্তানদের জন্য বরাদ্দ রাখেন, তাদের জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানে আন্তরিক ও মনোযোগী হন, তবে যুবসমাজে মাদকাসক্তির প্রতিরোধ বহুলাংশে সম্ভব। মাদকদ্রব্য পরিত্যাগের ব্যাপারে আসক্ত ব্যক্তিদের স্বভাব বদলে ফেলে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার। তরুণ যুবসমাজ অভিভাবক ও মুরব্বিদের নিয়ে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে মাদকবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। মাদকাসক্তি ত্যাগে আসক্তদের উৎসাহিত ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ দলমত নির্বিশেষে দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতাদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা বাঞ্ছনীয়।

হে তরুণ সমাজ, আসুন আমরা সচেতন হই, সতর্ক হই, ঝাঁপিয়ে পড়ি এই মরণ নেশার বিরুদ্ধে। সমসুরে জীবনের জয়গান গাই :

'জীবনের চেয়ে বড় কিছু নাই–নেই নিশ্চয়,
জীবনের চেয়ে অধিক মূল্য আর কিছু নাই;
তবে কেনো বন্ধু–অবোধ-চিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়,
ধুকে ধুকে মরে–হে প্রিয় বন্ধু আমার–
ধ্বংস করে সোনার জীবন–মাদক-দুর্নীত-সন্ত্রাস!
যেতে হবে দূর, আরও বহুদূর, পথ চলা বাকি সোনালি-জীবন...!'

বাল্যবিবাহের প্রভাব প্রতিরোধ ও আইন প্রয়োগে যুবসমাজের ভূমিকা : বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। বাল্যবিবাহের ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর বেঁধে দেওয়া হলেও এর আগে মেয়েদের বিয়ে হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মানসিক ও শারীরিক পরিপক্বতা আসার পূর্বে তারা বাবা-মা হয়ে যায়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার

বৃদ্ধি পায়।

শিশুকিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষিত হলে তারা সচেতন হবে এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যুবসমাজকেই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। মা-মাবাসহ অভিভাবকের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তাছাড়াও ছেলেমেয়ে প্রত্যেককেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মেয়েদেরকে এই বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা একহাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন, ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করলে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। বাল্যবিবাহ আইনে এই বিধান সম্পর্কে আমাদের সকলকে জানতে ও জানাতে হবে।

যৌতুকপ্রথা রোধে যুবসমাজের করণীয় : যৌতুকপ্রথা আজও এক সামাজিক ব্যাধি। যৌতুকের কারণে অনেক সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে, যাচ্ছে। মৃত্যুর হাতছানি নেমে আসছে অনেক নারীর জীবনে। জন অস্টিন বলেছেন, Dowry system paves the way to woman oppression. যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে এদেশের তরুণ-তরুণী যুবসমাজকেই সকলের আগে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণরা যদি চায়ের আসরে বসে সমাজ-সংস্কারের পক্ষে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়; আর নিজ নিজ বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণে তৎপর হয়; তাহলে শতবার পণপ্রথা নিবারণী আইন পাস করলেও আসল রোগের উপশম কিছুই হবে না। তরুণীরা পণ্যসামগ্রী হিসেবে নিজেদের না ভেবে আন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটালে সমাজে পুরুষদের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে কমে যেতে বাধ্য। প্রয়োজনে সবদিকে নারীমুক্তি আন্দোলনের ডাক ছড়িয়ে দিতে হবে এবং লেখাপড়া শিখে সমাজিক মূল্য ও মর্যাদা অর্জন করতে হবে। এভাবে পণপ্রথার বিষাক্ত-ক্ষতের যন্ত্রণা ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে পড়ে। নারী-পুরুষের স্বার্থ এক ও অভিন্ন, তাই নারীকে ভোগপণ্য হিসেবে না দেখে তার সঠিক মর্যাদা তাকে দিতে হবে। যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে। নারীকে কন্যা, জায়া, জননী করে ঘরে বন্দি না রেখে তাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই হবে। আমাদের প্রতিবেশী এবং পাড়া মহল্লা গ্রামের মানুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। যৌতুক বন্ধ করতে সবাইকে কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

জনসেবায় যুবসমাজের ভূমিকা : জনসেবায় সকলেরই অধিকার আছে। মানুষের সবকটি মহৎ গুণাবলির মধ্যে সেবাব্রত অন্যতম :

'অন্নহীনে অন্ন দান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে/তৃষ্ণাতুরে জল দান, ধর্ম ধর্মহীনে,
মূর্খজনে বিদ্যা দান, বিপন্নে আশ্রয়/রোগীরে ঔষধ দান, ভয়ার্তে সান্ত্বনা,/স্বার্থশূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান; স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।'

মোটকথা জনসেবার সময় যুবসমাজকে ভাবতে হবে যে,

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে যুবসমাজের ভূমিকা : এসিড ছোড়া একটি মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। যে এসিড ছোড়ে, সে একদিকে যেমন অন্যের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে, অন্যদিকে নিজেও কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। হয়তো বাকি জীবন জেলখানায় বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমাদের সব মানুষকে এসিড ছোড়ার ভয়াবহতার কথা বোঝাতে হবে। যারা সাধারণ মানুষের কাছে এত সহজে এসিড বিক্রি করে তাদেরকেও সতর্ক করতে হবে কিংবা শাস্তি দিতে হবে। একই সাথে কেউ এসিড দিয়ে আক্রান্ত হলে তাকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে (যেমন পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা), সে ব্যাপারটিও সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে যুবসমাজের ভূমিকা : আমাদের সামাজিক জীবনে এবং জাতীয় জীবনে আলোকিত মানুষ আজ খুবই জরুরি। আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম যুবসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। অন্নহীনে অন্ন এবং নিরক্ষরকে জ্ঞানের আলো দিয়ে আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে হবে। সবরকম বিভেদ-বিচ্ছেদ ভুলে, হানাহানি সংঘাত ভুলে, সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে যুবসমাজকে দেশ গড়ার কাজে ব্রতী হতে হবে, তবেই সোনার বাংলাকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছি আমরা তা বাস্তবে রূপ নিবে। আর এ জন্যে চাই আলোকিত মানুষ ও আলোকিত সমাজ। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের একটি উপদেশ প্রণিধানযোগ্য–'তুমি পৃথিবীকে যেমন পেয়েছ তার চেয়ে উন্নততর করে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'চলো সবাই পড়তে যাই/শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই।'

উপসংহার : সচেতন যুবসমাজ যদি উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং নিজেদেরকে আত্মসচেতন, স্বয়ম্ভর করে গড়ে তোলে, তবে দেশ গঠনে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। কারণ উপরোক্ত কর্তব্য সম্পাদান করতে গিয়ে তারা আগামী দিনের জন্য নিজেদের গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশ গঠনে স্মরণযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। বস্তুত আমাদের সংগ্রামী যুবসমাজ যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে সম্পন্ন করে এবং শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে তোলে তবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় হাতিয়ার হিসেবে তারা চির পরিচিত হবে। আমাদের দেশের মতো স্বল্পশিক্ষিত উন্নয়নশীল দেশে যুবসমাজই সকল আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল। মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি যুবক দেশ ও জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় তবেই জাতীয় জীবনে আসবে সামগ্রিক মুক্তি। নৈতিকতা উন্নয়নে যুবমসাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারলেই আমরা একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে। (সমাপ্তি)

মাইক্রোসফটের মিনি শহর

পছন্দ হোক বা না হোক, মাইক্রোসফট আছে সব জায়গায়। বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের তালিকায়। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? রেস্তোরাঁ, খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র, পাবলিক আর্টওয়ার্ক থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সবই রয়েছে এই ক্যাম্পাসে। তাই এই ক্যাম্পাসকে বলা যায় একটি মিনি শহরও।

মাইক্রোসফট কী?

মাইক্রোসফট একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কম্পিউটার প্রযুক্তি উৎপাদনকারী কোম্পানি। এটি বিভিন্ন কম্পিউটার ডিভাইসের জন্য সফটওয়্যার তৈরি, লাইসেন্স দেওয়া এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। এদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যারগুলো হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস। ১৯৮৫-এর আগেই উইন্ডোজ বাজারে এনেছিল মাইক্রোসফট। কিন্তু সেগুলো পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। ওএসটি উন্নত করার সুযোগ ছিল অনেক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ম্যাক্সিকোর আলবুকুয়ের্ক-এ মাইক্রোসফটের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ সালের ৪ এপ্রিল। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠা করেন দুই বন্ধু মিলে। তারা হলেন বিল গেটস ও পল এলেন।

বিল গেটসের প্রথম দিককার মন্ত্র ছিল 'বিশ্বের প্রতিটি ডেস্কে একটি করে কম্পিউটার যেটিতে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার চলবে'। বলা যায়, গেটস তার এ স্বপ্নপূরণে মোটামুটি সার্থক হয়েছেন। মাইক্রোসফটকে একটু একটু করে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য বিল গেটস এবং তার বিশাল কর্মী বাহিনী অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

রেডমন্ড ক্যাম্পাস

বিশ্বব্যাপী মাইক্রোসফটের রয়েছে মোট ৬০০টি অফিস। এর মধ্যে এটির সদর দপ্তর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের রেডমন্ড শহরে। রেডমন্ড কার্যালয়টি অবস্থিত ৫০০ একর জায়গা জুড়ে। অফিসের স্পেস হচ্ছে প্রায় ৮ মিলিয়ন স্কয়ার ফিট। গত তিরিশ বছর ধরে এই রেডমন্ডের অফিসে রয়েছে মাইক্রোসফট।

বর্তমানে এই ক্যাম্পাসে ভবন সংখ্যা রয়েছে ১২৫টি। উইন্ডোজ আর অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি) এর

সবচেয়ে বড় দুটি প্রডাক্ট হলেও সার্চ, এমএসএন, এক্সবক্স, জুন মিউজিক প্লেয়ার, উইন্ডোজ সার্ভার, এসকিএল সার্ভার, ভিজুয়াল স্টুডিও ইত্যাদি অসংখ্য গ্রুপের অফিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো এলাকার এই ভবনগুলো জুড়ে।

এতগুলো অফিসে কাজ করে প্রায় ৪০ হাজার লোক। ভবনে এত মানুষের আসা-যাওয়ার জন্য রয়েছে শ'খানেক শাটল। মজার বিষয় হচ্ছে শাটলে চড়লে আবার রেটিং দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। শাটলের ভ্রমণে আপনি খুশি কি না সেটার রেটিং দিতে পারা যাবে। এছাড়া কর্মীদের অফিসে আনা-নেওয়ার জন্য রয়েছে কমিউটার বাস।

বিশ্বব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার। এর মধ্যে ইউএসএতে কাজ করে প্রায় ৮০ হাজার লোক।

একটি শহরে মানুষের প্রয়োজনীয় যা কিছু থাকা উচিত যেমন অফিস, মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, পার্লার, নিরাপত্তা, যাতায়াত সুবিধা ইত্যাদি সব কিছুই রয়েছে এই ক্যাম্পাসে। তাই একে ডাকা হয়ে থাকে মিনি শহর নামেও।

ট্রি হাউজ অফিস

এই রেডমন্ড ক্যাম্পাসে মাইক্রোসফটের একটি অসাধারণ উদ্যোগ হলো এই ট্রি হাউজ অফিস। প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করে অসাধারণ পরিবেশে কাজ করা যায় কীভাবে তার একটি উদাহরণ তৈরি করেছে এই ট্রি হাউজ অফিস। আরামদায়ক ও আনন্দময় পরিবেশে নির্ভার হয়ে যেন কর্মীরা কাজ করতে পারেন সেই জন্য গ্রহণ করা হয়েছে অভিনব এই পদ্ধতি। সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে পারে এমন এই অফিসের নকশা করেছেন বিখ্যাত স্থপতি পেট নেলসন।

অফিসটি অবস্থিত মাটি থেকে ১২ ফুট উঁচুতে। এই ট্রি হাউজ অফিস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র কাঠ। দেয়ালে তৈরি করা হয়েছে পোড়া কাঠ দিয়ে। আলো বাতাস চলাচলের জন্য জানালা রাখা হয়েছে দুই পাশে ও ছাদে। পুরো অফিস এরিয়াতে থাকছে ওয়াইফাই ব্যবস্থা। প্রতি ভবনে রয়েছে একটি করে গ্যাসচালিত ফায়ারপ্লেস। খাওয়ার প্রয়োজন হলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানেই রয়েছে ছোট একটি ক্যাফেটেরিয়া। অফিসের বাইরে বসার জন্য রয়েছে চেয়ার ও বেঞ্চ। সেগুলো এমন করে তৈরি করা হয়েছে যাতে শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাতে কোনো ক্ষতি হবে না। ক্যাম্পাসের তিনটি গাছবাড়ির মধ্যে দুটি কর্মচারীদের জন্য। তৃতীয়টি একটি লাউঞ্জ।

দ্য কমনস

প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে এই জায়গা অবস্থিত। ক্যাম্পাসের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই জায়গার নাম 'দ্য কমনস'। ধরুন কাজ করতে করতে আপনার মনে হলো আরে চুলটা তো কাটা দরকার। কিংবা ব্যাংকের কাজটা তো শেষ করা হয়নি। এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা মাথায় রেখে কর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এই ভবন।

মূলত এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট, নিত্যপ্রয়োজনীয়

বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটার দোকান। যাতে করে এখানকার কর্মীদের আলাদা করে মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। টুকিটাকি দরকারি কাজ যাতে তারা এখানেই সেরে নিতে পারে। এতে করে অফিসকেন্দ্রিক জীবন হয়ে ওঠে আরও সহজ ও আনন্দময়। এই জায়গায় কর্মীদের টুকিটাকি প্রয়োজনীয় সব জিনিসই রয়েছে। যেমন, মোবাইল ক্যারিয়ার, টাকা তোলার বুথ, মিউজিকের ইন্সট্রুমেন্টের দোকান, পার্লার, ম্যাসাজ করার জায়গা, কফি শপ, পিজার দোকান, স্যুপের দোকান, চকলেট, বার্গার, স্যান্ডুইচ ইত্যাদি হাজারো পণ্যের সমাহার। এছাড়াও রয়েছে এলাকাভিত্তিক খাবারের দোকান যেমন, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি ইত্যাদি। আবার কেউ যদি ভেজিটেরিয়ান হয় তবে তার জন্য রয়েছে আলাদা কর্নার।

রয়েছে বিশাল এক সাইকেলের দোকান। যদি সাইকেল মেরামত করানোর প্রয়োজন পড়ে কিংবা নতুন করে কিনতে চান তবে এখানে ঢুঁ মারতে পারেন। শুধু এই দ্য কমনস জায়গা দেখতেই চলে যেতে পারে পুরোটা সকাল।

বিনোদন

কর্মীদের কাজে যাতে একঘেয়েমি না আসে তার জন্য রয়েছে বিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা। তাই এই অফিসে একঘেয়ে লাগার কোনো সুযোগ নেই। রয়েছে সকার খেলার মাঠ। তাও আবার একটি না একাধিক।

যেহেতু আমেরিকানরা এই খেলা বেশি পছন্দ করে থাকেন। তা ছাড়া বাউন্সবল, বাস্কেটবল, সফটবল, বলিবল খেলারও জায়গা রয়েছে। তাছাড়া ক্যাম্পাসজুড়ে রয়েছে হাঁটাচলার জন্য জুড়ে রাস্তা। তাই এই অফিসে কাজে কখনো একঘেয়েমি আসে না।

সবুজের সমারোহ

কংক্রিটের এই শহরে নিশ্বাস ফেলার মতো স্বস্তিকর জায়গা কোথায়? তবে অফিসের পরিবেশই যদি হয়ে ওঠে সেই নিশ্বাস ফেলার মতো স্বস্তিকর জায়গা এর থেকে বেশি আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। এক অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার, আর সবুজের ছোঁয়া রয়েছে পুরো রেডমন্ড ক্যাম্পাসজুড়ে। নানা রকম গাছ এই ক্যাম্পাসের চারপাশে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় পাখি, কাঠবিড়ালিসহ নানারকম প্রাণীর দেখাও। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে কাজ করছে। নয়নাভিরাম সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবেই।

নিরাপত্তা

এখানকার সব অফিস ইলেক্ট্রনিক আইডি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, দরজার সঙ্গে লাগানো ছোট মডিউলটাতে নিজের আইডি মেলে ধরলে ক্লিক করে দরজা খুলে যায়। তাই বাইরের কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। মাইক্রোসফটের অফিসগুলোকে চিহ্নিত করা হয় নম্বর দিয়ে। সাধারণত একই ডিভিশনের বিল্ডিংগুলো কাছাকাছি থাকে। প্রত্যেকটি ডিভিশনের রয়েছে একজন প্রেসিডেন্ট যারা সরাসরি সিইওর কাছে বিস্তারিত কাজের বিষয়ে রিপোর্ট করেন। এর অফিসগুলো সাধারণত দরজাওয়ালা ব্যক্তিগত অফিস রুম টাইপের। প্রত্যেক রুমেই থাকে কমপক্ষে দুটি সাদা বোর্ড, এক বা একাধিক বইয়ের সেলফ এবং অফিস ডেস্ক।

পুনর্নির্মাণের ঘোষণা

ওয়াশিংটনের রেডমন্ডে অবস্থিত প্রধান ক্যাম্পাস ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট। মূলত কার্যক্রমের প্রসার বাড়াতে পুনর্নির্মাণের এই ঘোষণা দেওয়া হয়। নতুন এই অফিসে আরও নতুন আট হাজার কর্মীর জায়গা হবে। বর্তমান সময়ে যখন এক খণ্ড জমির দাম অনেক বেশি। আর মাইক্রোসফটের কাছে রয়েছে ৫০০ একর জায়গা। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই জমি কাজে লাগানোর। সবার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, উচ্চমানের প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ভবন এবং জনপ্রিয় পাবলিক স্পেসের সঙ্গে মিল রেখে মাইক্রোসফটের কার্যালয়কে স্মার্ট মিনি শহরে রূপান্তর করা হবে। রূপান্তর করতে সময় লাগবে পাঁচ থেকে সাত বছর।

এই প্রকল্পে নতুন ১৮টি ভবন যোগ হবে এবং আরও ৬৭ লাখ বর্গফুট কাজের জায়গা তৈরি হবে। মোট ভবন সংখ্যা হবে তখন ১৩১টি। থাকবে ফুটবল, রাগবি, সফটবলের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলার মাঠ। শুধু এই অফিসের লোকজনই নয় আশপাশের বাসিন্দারাও এই মাঠে খেলার সুযোগ পাবেন।

মাইক্রোসফটে ক্রিকেট মাঠ!

বেশিরভাগ আমেরিকানরাই ক্রিকেট খেলে না। তবে মাইক্রোসফটের নতুন এই ক্যাম্পাসে থাকবে ক্রিকেটের মাঠ। তার কারণ মাইক্রোসফটের বেশিরভাগ কর্মী হচ্ছেন ভারতীয়। এমনকি তাদের সিইও সত্য নাদেলাও। তা ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মতো ক্রিকেটপাগল মানুষ। তাদের প্রিয় খেলার কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। তাই পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে ক্রিকেটের মাঠও।

মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ পরিচালক গ্রেগ শ' জানিয়েছেন, 'ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট অনুরাগী কর্মীরা কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের স্বপ্নের ক্রিকেট মাঠ পাচ্ছেন।'

উল্লেখযোগ্য দিক

নতুন এই স্মার্ট মিনি শহরের উল্লেখযোগ্য দিক হলো ক্যাম্পাসটি হবে গাড়িমুক্ত। যা কিনা হাঁটাচলা ও সাইকেল চালানোর জন্য উপযুক্ত স্থান। নতুন এই ক্যাম্পাসে গাড়ি ও মোটরসাইকেল রাখার জায়গা আন্ডারগ্রাউন্ডে। এছাড়াও প্রাকৃতিক আলো, খোলা জায়গায় অনেক সৃজনশীল বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো হবে। থাকবে নিজস্ব একটি রেলওয়ে স্টেশনও। তবে সেটা চালু হবে ২০২৩ সালে। ২ একরের খোলামেলা একটি পার্কও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এখানে। পুরো ক্যাম্পাস ঘিরে তেমনই পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এই স্মার্ট মিনি শহরটির মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীরাও অনেক উপকৃত হবেন। যার মধ্যে রয়েছে ওয়াশিংটন শহরের সিয়াটেল, টাকোমা, অলিম্পিয়া এবং এভারেট। কারণ এই মিনি শহরে তাদেরও প্রবেশাধিকার রয়েছে। এই শহর বা ক্যাম্পাস শুধুমাত্র আর কর্মীদের জন্য থাকছে না। তৈরি হবে একটি আধুনিক বিপণন কেন্দ্র। পরিবহন ব্যবস্থার অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন করা হবে। পরিবহন খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে ১৫০ মিলিয়ন এবং ৬.৭ মিলিয়ন বর্গফুট পুনর্নির্মাণের জন্য জায়গা নেওয়া হয়েছে। থাকবে আরও বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ের ব্যবস্থা। হবে আরও বেশি পরিবেশবান্ধব। নতুন প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মূল ক্যাম্পাসের ভবন সংখ্যা বেড়ে হবে ১৩১টি। এর মধ্যে পুরনো ১২টি ভবন ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হবে। প্রতিদিন এখানে কাজ করে এমন ৪৭ হাজার কর্মীর জন্য আধুনিক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে।

ভবন পরিচালনায় সফটওয়্যার

নতুন এই ভবন পরিচালনার জন্য প্রকৌশলীরা উদ্ভাবন করেছেন একটি সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার দিয়েই প্রকল্পের সব ভবন পরিচালনা করা হবে। আর এতে করে ভবন পরিচালনার খরচ অনেকটাই কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেমন হাজার হাজার হিটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, পাখা ও বাতি প্রভৃতিকে অনুসরণ করার জন্য হাজার হাজার সেন্সর সংযুক্ত করা হবে। আর এ প্রক্রিয়ায় তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবন পরিচালনার খরচ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। গাছপালায় আচ্ছাদিত এই ক্যাম্পাসটিকে বিশ্বের সবচেয়ে স্মার্ট করপোরেট কর্মক্ষেত্রে রূপান্তর করার জন্য প্রকৌশলীরা বদ্ধপরিকর।

প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো অত্যাধুনিক করে তুলতে তারা অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। বলা হয় এই স্মার্ট ভবনগুলো হবে একেকটি স্মার্ট শহরের মতো।

লায়লা আরজুমান্দ
দেশ রূপান্তর ১৯ মার্চ ২০১৯

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার বিষয় ছয়টি–বাংলা, ইংরেজি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা, সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলাদেশ বিষয়াবলি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি। বাংলাদেশ বিষয়াবলি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছেন ৩৫তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা রবিউল আলম লুইপা

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বেশিরভাগ প্রার্থী পরীক্ষার শেষ দিকে সময়ের অভাবে যে বিষয়গুলোর উত্তর না করেই ছেড়ে আসেন, সেগুলোর মধ্যে 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' অন্যতম। তাই এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তুতি হলো, প্রতি ৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য ৬ মিনিট মাথায় রেখে প্রতি ৩ মিনিটে এক পৃষ্ঠা লেখার নিয়মিত চর্চা করা। একটি প্রশ্নের উত্তর বেশি সময় ধরে লিখে অন্য প্রশ্নের উত্তরে কম সময় দেওয়া বা ছেড়ে আসা যাবে না। এর জন্য কোনো প্রশ্ন কমন পড়লে সেটিতে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলির টপিকগুলোর মধ্যে–বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধ, সরকারের অঙ্গসংগঠন, বাংলাদেশের ভূগোল, বাংলাদেশের অর্থনীতি অধ্যায়গুলো থেকে প্রতিটি বিসিএসে দু-একটি প্রশ্ন থাকেই। বাংলাদেশ বিষয়াবলির প্রতিটি অধ্যায়ের টপিক ধরে ধরে মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ, কোটেশন প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত তথ্যের

সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন পেলেই তথ্যটি ব্যবহার করবেন। যেমন–ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নের জন্য তৈরি করা '১৯৫২ সালে বিভিন্ন ভাষাভাষীর শতকরা হারের পরিসংখ্যান' মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রশ্নে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জিডিপিতে খাত অনুসারে অবদান, মাথাপিছু আয়, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, রেমিট্যান্স, বাজেট, এডিপি ইত্যাদি তথ্য 'অর্থনীতি' সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করুন। একইভাবে ভাষা আন্দোলনের ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য ভাষাসংগ্রামের জন্য গঠিত কমিটিগুলোর নাম ও গঠনের তারিখ, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের নাম ও প্রাপ্ত আসন, ছয় দফা আন্দোলনের দফাগুলোর শিরোনাম আগে থেকেই নোট করে রাখুন।

সংবাদপত্র থেকে কোটেশন দেওয়ার সময় কোটেশনের নিচে সংবাদপত্রের নাম ও তারিখ উল্লেখ করতে ভুলবেন না। মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ ও কোটেশনের জন্য বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা ও গবেষণাধর্মী বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন। আর পুরো প্রস্তুতির জন্য গাইড বইয়ের পাশাপাশি মোজাম্মেল হকের উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র, আরিফ খানের বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাসংবলিত বই, মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বইগুলো দেখতে পারেন। পুরো সংবিধান মুখস্থ না করে যেসব ধারা থেকে নিয়মিত প্রশ্ন হয়, যেমন–সংবিধানের প্রথম তিন অধ্যায়ের ১ থেকে ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদ; এগুলো ব্যাখ্যাসহ পড়ুন। পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদও (৪৯, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭৭, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১১৭-১১৯, ১২৭, ১৩৭, ১৪১, ১৪২) পড়ে নেবেন। সংবিধানের ধারা হুবহু না লিখে নিজের ভাষায় লিখলেও অসুবিধা নেই। প্রশ্ন ৫ কিংবা ১০ নম্বর–যে আঙ্গিকেই আসুক–ভূমিকা, মূল বক্তব্য, উপসংহার–এই ফরম্যাটে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন। থিওরি পরীক্ষায় প্রেজেন্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাতের লেখা যেমনই হোক, প্যারা করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ভালো নম্বরের জন্য সাম্প্রতিক তথ্যগুলো আপটুডেট থাকতে হবে। উত্তরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য আগে থেকেই নোট করে রাখবেন। পরিবেশসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বনভূমির শতকরা হার, কার্বন নিঃসরণের শতকরা হার, পারমাণবিক বোমা মজুদের সংখ্যা, আলোচিত পাঁচটি পরিবেশ সম্মেলনের সাল ও আয়োজিত রাষ্ট্রসংক্রান্ত তথ্যগুলো সংযুক্ত করতে পারেন। অনুরূপভাবে সার্কভুক্ত দেশের মানচিত্র, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানচিত্র, বিশ্বমানচিত্রে যুদ্ধ ও সংঘাত কবলিত দেশগুলো চিহ্নিতকরণ, কাশ্মীরের মানচিত্রে ভারত ও পাকিস্তানের অংশ আগে থেকেই দেখে যাবেন; প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে এগুলো সংযুক্ত করবেন। মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ ও

কোটেশনের জন্য বিভিন্ন সংস্থার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকা, গবেষণাধর্মী বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন। সংবাদপত্র থেকে কোটেশন দেওয়ার সময় কোটেশনের নিচে সংবাদপত্রের নাম ও তারিখ উল্লেখ করতে ভুলবেন না। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির প্রস্তুতি নিতে গাইড বইয়ের পাশাপাশি তারেক শামসুর রেহমানের 'বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর', 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি', শাহ মো. আব্দুল হাইয়ের 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি' বইগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি তিনটি অংশে বিভক্ত–Conceptual Issues, Empirical Issues I Problem Solving।

Conceptual Issues : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণা, বিশ্বনেতৃত্ব, ক্ষমতা ও নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র ও কূটনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক পরিবেশ প্রভৃতি অধ্যায় থেকে ৪ নম্বরের ১০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

Empirical Issues : জাতিসংঘ, ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, বিশ্বের বিবদমান বিষয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অধ্যায়গুলো Empirical Issues অংশের অধ্যায়। এই অংশে ১৫ নম্বরের চারটি প্রশ্ন থেকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিগত বিসিএস প্রশ্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় সব বিসিএসে–

১. জাতিসংঘ
২. মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা
৩. দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক
৪. বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি–টপিকগুলোর ওপর প্রশ্ন এসেছে।

Problem Solving : সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বাণিজ্য, পরিবেশ, অস্ত্র হ্রাসকরণ, বৈদেশিক সাহায্যসংক্রান্ত যেকোনো টপিক নিয়ে ১৫ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, বিকল্প কোনো অপশন থাকবে না। এখানে তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আপনাকে ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ ও এর সমাধানের উপায়গুলো তুলে ধরতে হবে।

■ রবিউল আলম লুইপা
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

রক্তে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ডা. মাহবুবর রহমানের কিছু পরামর্শ

গুড কোলেস্টেরল (HDL) পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ মিলিগ্রামের উপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ মিলিগ্রামের উপরে থাকতে হবে। মন্দ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা সুস্থ মানুষের জন্য ১৩০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে ১০০-এর মধ্যে রাখা নিরাপদ। আর যাদের ইতিমধ্যে হার্টে ব্লক ধরা পড়েছে বা ব্রেন স্ট্রোক অথবা পায়ের রক্তনালীতে ব্লক ধরা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে LDL এর মাত্রা ৭০ মিলিগ্রামের নিচে রাখতে হবে। Triglycerides এর মাত্রা ২০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখলে ভালো।

শরীরের চর্বি বা কোলেস্টেরল নিয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। এমনকি ডাক্তারদের মধ্যেও এটা আছে। বিশেষ করে মেডিসিনে যাঁরা প্র্যাকটিস করেন তাঁদের অনেকের মধ্যেও একটি বদ্ধমূল ভুল ধারণা আছে। ধারণাটি হলো–যতদিন কোলেস্টেরল বেশি পাওয়া যাবে ততদিন ওষুধ খেতে হবে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

শরীর গঠনে অন্যান্য উপাদানের মতো চর্বি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোটি কোটি দেহকোষের প্রাচীর, বহুসংখ্যক হরমোনসহ অসংখ্য শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো কোলেস্টেরল। প্রাণীর মস্তিষ্কের প্রায় পুরোটাই কোলেস্টেরল দিয়ে তৈরি। তাহলে কোলেস্টেরল খারাপ হবে কেন?

বিষয়টি খারাপের বা ভালোর নয়। প্রতিটি জিনিসেরই একটি মাত্রা থাকে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের কোলেস্টেরল মাত্রা জানতে হলে অন্তত ১০ ঘন্টা খালি পেটে একটি লিপিড প্রোফাইল করা দরকার। লিপিড প্রোফাইলে total cholesterols, high density lipoprotein- HDL, low density lipoprotein-LDL, এবং Triglycerides এর বিস্তৃত বিবরণ থাকে। এই চারটি উপাদানের আনুপাতিক উপস্থিতি পরবর্তী চিকিৎসা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকে শুধু total cholesterols এবং triglycerides পরীক্ষা করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাতে করে HDL এবং LDL এর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে বোঝা সম্ভব হয়

না। সুতরাং সকলের উচিত বয়স ৩০ হলে অথবা পরিবার বা বংশে যদি অল্প বয়সে কেউ হৃদরোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় তাহলে লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করা।

ভালো বনাম খারাপ কোলেস্টেরল

রক্তনালীর দেয়ালে জীবন্ত কোষের অবিরাম ভাঙাগড়া চলতে থাকে। সুস্থ মানুষের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে একটি পারফেক্ট ব্যালেন্স থাকে। কিন্তু যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল আছে, যারা ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করেন, স্থূল শরীর ব্যায়ামহীন কাটান তাদের রক্তনালীর জীবন্ত কোষের ভাঙা গড়ার প্রক্রিয়াটি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

কোষের এই ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ায় HDL কোলেস্টেরল রক্তনালী রক্ষায় পজিটিভ ভূমিকা পালন করে। এজন্য একে গুড কোলেস্টেরল বলা হয়ে থাকে। আর LDL কোলেস্টেরল বিশেষ করে পরিবর্তিত oxidized LDL রক্তনালীর দেয়ালে একধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে এই প্রদাহের ফলে রক্তনালীর গাত্রে চর্বির দলা (plaque) গড়ে উঠে রক্তনালীকে সরু করে রক্তের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে।

সাধারণ মানুষ এটাকে ব্লক বলে থাকেন। কোনো ব্লক যখন রক্তনালীর কমপক্ষে ৭০% ভাগ লুমেন সরু করে দেয় তখন অল্প পরিশ্রমে বুকে ব্যথা, চাপ, শ্বাসকষ্ট বা ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়। চিকিৎসার ভাষায় এটাকে বলে অ্যানজাইনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হার্ট ব্লক বা ব্রেন স্ট্রোক সৃষ্টিতে কোলেস্টেরলের ভূমিকা কেন্দ্রীয়। যার যত গুড কোলেস্টেরল (HDL) বেশি থাকবে এবং মন্দ কোলেস্টেরল (LDL) কম থাকবে সে তত নিরাপদ থাকবে।

কেন এই ভারসাম্যহীন কোলেস্টেরল?

আমরা যখন রোগীকে বলি যে, গরু খাসীর মাংস এড়িয়ে চলুন, তখন অনেক রোগী প্রশ্ন করেন, 'কেন স্যার, গরু তো নিজে ঘাস খায়, তাহলে তার মাংসে এত চর্বি কীভাবে হয়?'

কথা সত্য। গরু ঘাস খায়। তবে গরুর শারীরিক গঠন ভিন্ন, তার ফিজিওলজি ভিন্ন। আর শরীরের চর্বি তৈরির কারখানা হলো লিভার। যার লিভার চর্বি তৈরির জন্য যত মুখিয়ে থাকে সে যতই শাকসবজি ঘাস খাক না কেন লিভার তার কাজ চালিয়ে যাবেই।

এটা হয় যখন শরীরের মেটাবলিজম পাল্টে যায়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি, অ্যালকোহল পান, বাড়তি ওজন, হাঁটাচলা না করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো উপস্থিত থাকে। এসব কারণে লিভারের কোষে রিসেপ্টর সমস্যা দেখা দেয়। ফলে অতিরিক্ত মন্দ কোলেস্টেরল রক্তে ভাসতে থাকে। এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষ করে হার্ট ও ব্রেনের রক্তনালীর দেয়ালে চর্বির দলা জমে জমে ব্লক তৈরি করতে থাকে।

প্রতিরোধের উপায় কি?

প্রথমত যেসব কারণে কোলেস্টেরল মেটাবলিজম ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে সেগুলোর প্রতিকার করতে হবে। ডায়াবেটিসকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। উচ্চ রক্তচাপের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে। ওজন কমাতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রয়োজনে চর্বি কমাতে নিয়মিত statin জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের বয়স ৪০ হলে সারাজীবনের মতো statin খেতে হবে। ডায়াবেটিসের ওষুধ যেমন সারাজীবন খেতে হয় তেমনি চর্বির ওষুধও সারাজীবন খেতে হবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া statin কখনো বন্ধ করা যাবে না। অনেক ডাক্তারকে দেখা যায় চর্বির মাত্রা স্বাভাবিক হলে ওষুধ বন্ধ করে দেন। এটা একটি ভুল ধারণা এবং অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ডায়াবেটিসের ওষুধ বন্ধ করলে রক্তের সুগার যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কোলেস্টেরলের ওষুধ বন্ধ করলে তা বাড়বেই।

লক্ষ্যমাত্রা কত?

গুড কোলেস্টেরল (HDL) পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ মিলিগ্রামের উপরে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ মিলিগ্রামের উপরে থাকতে হবে। মন্দ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা সুস্থ মানুষের জন্য ১৩০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে ১০০-এর মধ্যে রাখা নিরাপদ। আর যাদের ইতিমধ্যে হার্টে ব্লক ধরা পড়েছে বা ব্রেন স্ট্রোক অথবা পায়ের রক্তনালীতে ব্লক ধরা পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে LDL এর মাত্রা ৭০ মিলিগ্রামের নিচে রাখতে হবে। Triglycerides এর মাত্রা ২০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখলে ভালো।

কি খাবেন?

প্রচুর তাজা শাকসবজি, ফলমূল, উদ্ভিজ প্রোটিন বেশি করে খাবেন। পর্যাপ্ত মাছ খাবেন, সামুদ্রিক মাছ হলে আরো ভাল। মাংস খেতে চাইলে সপ্তাহে দুদিন মুরগির মাংস খেতে পারেন, তবে চামড়া, গিলা, কলিজা এসব ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে খাবেন। দিনের দুবেলা ব্রাউন রুটি এবং দুপুরে একবেলা পরিমিত পরিমাণে (সম্ভব হলে ঢেঁকিছাটা চালের) ভাত খাবেন।

কি খাবেন না?

শরীরের মোট চর্বির প্রায় ৮০ শতাংশ তৈরি বা নিয়ন্ত্রণ করে লিভার। বাকি মাত্র ২০ শতাংশ আসে খাদ্য থেকে। তাই চর্বি নিয়ন্ত্রণে খাদ্য উপাদানের প্রভাব তুলনামূলক কম। তা সত্ত্বেও প্রাণীজ লাল মাংস যেমন: গরু, খাসী, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ, উট, হাঁস এবং ঘি, মাখন, সরযুক্ত ঘন দুধ, চিংড়ি, পোলাও, বিরিয়ানি, যেকোনো তেলে কড়কড়ে ভাজা খাদ্য ইত্যাদি এড়িয়ে চলা উত্তম। এছাড়া যেকোনো প্রাণীর শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না খাওয়া উচিত। তবে শরীরের প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল ও পর্যাপ্ত আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি যোগান দিতে প্রতিদিন একটি কুসুমসহ ডিম ও পাতলা সরমুক্ত এক কাপ দুধ পান করা স্বাস্থ্যকর।

ডা. মাহবুবর রহমান
সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট, ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল
বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৫ জুলাই ২০১৯

সুস্থতার জন্যে চাই আনন্দময় জীবনযাপন ও নিয়মানুবর্তিতা

আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে
শাখে শাখে পাখি ডাকে,
কত সুধা চারিপাশে।
আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।

সত্যজিৎ রায়ের এই গানটি আমাদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করে। আনন্দটাই আমাদের জীবনে স্বাভাবিক, তবে জীবনপথে চলতে গিয়ে নানা ঘটনায় কখনো কখনো আমরা ভারাক্রান্ত হই। দুঃখ, বেদনা, বিষাদে ছেয়ে যায় আমাদের মন। তখন যদি আমরা কোনোভাবে নিজের ভেতরে আনন্দ নিয়ে আসতে পারি, আনন্দের গান শুনি কিংবা 'আনন্দ' এবং 'শান্তি' এই শব্দ দুটো বার বার উচ্চারণ করি, তাহলে ভেতর থেকে একটা শক্তি অনুভব করব। নিজের দুঃখ, দৈন্যগুলোর সামনে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করব। আসলে শব্দ এবং আমাদের কথার একটা শক্তি আছে। তাই আমি মনে করি, ইতিবাচক শব্দ, আনন্দময় কর্মব্যস্ততা এবং মেডিটেশন চর্চার মধ্য দিয়ে সুস্থ ও প্রশান্ত জীবনযাপনের পাশাপাশি তারুণ্যকে দীর্ঘায়িত করা যায়।

মুক্ত আলোচনার ৯২তম পর্বে একথাগুলো বলেন কোয়ান্টাম পরিবারের বর্ষীয়ান সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যাংকিং এন্ড ট্রেনিং কনসালটেন্ট বাবু সুকুমার চক্রবর্তী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।

বাবু সুকুমার চক্রবর্তী বলেন, সঙ্গীতের রয়েছে অসাধারণ উজ্জীবনী ক্ষমতা। সুন্দর ও আনন্দময় সঙ্গীত আমাদের মনকে প্রশান্ত করে। মনে একটা উৎফুল্ল ভাব নিয়ে আসে। সারা পৃথিবীতে সঙ্গীতের এই উজ্জীবনী ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। গবেষকরা দেখেছেন, রোগ নিরাময়ে, রোগীকে আনন্দিত রাখতে এবং নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সঙ্গীত বেশ সাহায্য করে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে সবসময় প্রাণবন্ত থাকতে বেশ সাহায্য করেছে।

তিনি আরো বলেন, জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের 'অমরত্ব' লেখাটি আমার খুব পছন্দের। সেখানে তিনি বলেছেন, জীবন আমাদের কাছে কতটা প্রিয়। দীর্ঘ আয়ু লাভের পর শয্যাশায়ী হয়েও মানুষ আরো বহুদিন বেঁচে থাকতে চায়। মরতে চায় না। পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও মরতে চায়নি। অমৃতের সন্ধানে তারা অনেক অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছে। কিন্তু লাভ হয়েছে শুধু রসায়ন বিজ্ঞানের, মৃত্যুর কোনো ওষুধ কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। অতএব মৃত্যু আসবেই সবার জীবনে। তাই বেঁচে থাকাটা আনন্দময় হওয়া প্রয়োজন। আমি তাই সবসময় আনন্দে থাকি এবং থাকার চেষ্টা করি। এখনো আমার ঘুমাতে কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না। খরাব long happy strong grow young বলতে বলতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গুরুজীর শেখানো সূত্রগুলো অনুসরণ করে এই ৮৪ বছর বয়সেও আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, জীবন একইসাথে আনন্দ এবং বিষাদে পরিপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কখনো কখনো এমন সময় আসে, মনে হয় আর সম্ভব না, আর পারছি না। কিন্তু তারপরও একসময় আমরা ঠিকই ঘুরে দাঁড়াই, আবার এগিয়ে যাই। সেই দুঃসহ সময়ের কথা একসময় বেমালুম ভুলেও যাই। এটাই আমাদের স্বভাব। দুঃখের দিনে তাই সুখের স্মৃতিগুলো স্মরণ করে ইতিবাচক থাকতে হবে। ইতিবাচকতাকে লালন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমার কর্মজীবনের একটা বড় সময়, প্রায় ছয় বছর, সরকারি দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে আমি জাপানে ছিলাম। দেখেছি, জাপানিদের গড় আয়ু আমাদের চেয়ে প্রায় ২৫ বছর বেশি। জাপানে আমার যিনি দোভাষী ছিলেন, তার বয়স ছিল সে-সময় ৭৫ বছর। আর আমার বয়স তখন ৪৫। অথচ আমরা দুজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝা যেত না–কার বয়স বেশি। তাকে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, জাপানিদের এই দীর্ঘ তারুণ্যের পেছনে রহস্য তিনটি। প্রথমত, সময়ানুবর্তিতা। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে প্রত্যেকটি কাজ তারা করে সময়মতো। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসক তাকে দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন, এর অতিরিক্ত সে এক ক্যালরি খাবারও বেশি খাবে না। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ে খাবার গ্রহণ। অর্থাৎ যখন যে খাবারটা তাদের খাওয়ার কথা, সেটা প্রাতঃরাশ মধ্যাহ্নভোজ নৈশভোজ–তারা ঠিক সে-সময়েই তা খাবে, যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই তখন থাকুক। আমি দেখেছি কমবেশি সব জাপানিরাই এই নিয়মগুলো মেনে চলেন। যার ফলে তারা দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘ তারুণ্যের অধিকারী হন। প্রসঙ্গক্রমে জাপানিদের নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যা তিনি একশ বছরেরও বেশি সময় আগে লিখেছেন তার জাপান-যাত্রী গ্রন্থে–'জাপানিরা বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।'

দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনের উপায় নিয়ে ড. মোহাম্মদ মজিদ বলেন, যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা কাটিয়ে সবসময় ইতিবাচক থাকার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া হলো, নিজ নিজ ধর্মবাণী পাঠ করা। যখনই খুব মন খারাপ হয় বা উদ্যমহীন মনে হয় নিজেকে, তখন ধর্মবাণীতে চোখ বুলিয়ে নিলে মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আমি দেখেছি, আল কোরআনের যে বাংলা মর্মবাণী, এটা পড়লে মন শান্ত হয় এবং যখন কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে, মর্মবাণীর যে-কোনো জায়গা থেকে এক দুই পৃষ্ঠা পড়লে কোনো না কোনোভাবে সে সমস্যামুক্তির একটা সূত্র পেয়ে যায়।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

event.quantummethod.org.bd

প্রকল্প সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৭ ব্যাচের ৫৭ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন জিপিএ ৫ (A+) পাবার গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৩১ জন সদস্য গ্রেড A পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাশের হার ৯৫%। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী সকল সদস্যকে এইচডিএফ-এর পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন!!

A+ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক	নাম ও সদস্য নম্বর
১.	মোসা. জান্নাতুন নেসা (১২৬৬)	৭.	লিমা খাতুন (১২৯১)
২.	মোসা. হিভা আনিকা (১২৭০)	৮.	আফসানা রিতি (১২৯২)
৩.	পাপিয়া মীর (১২৭২)	৯.	মোসা. মুসফেরা খাতুন (১২৯৩)
৪.	স্যামলী খাতুন (১২৭৮)	১০.	মো. আশিকুর রহমান (১২৯৬)
৫.	ইশরাত জাহান মাহফুজা (১২৮০)	১১.	মো. জামিয়ার রহমান (১৩০১)
৬.	মোসা. সায়মা জিম (১২৮৩)	১২.	গোলাম রব্বানী সুজন (১৩০৮)

A পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও সদস্য নম্বর	ক্রমিক	নাম ও সদস্য নম্বর
১.	মোসা. তামান্না উলফাত (১২৬৭)	১৭.	আবু তাহের (১২৯৮)
২.	মোছা. সুবর্ণা আক্তার (১২৬৮)	১৮.	মো. আক্কাসুর রহমান (১৩০০)
৩.	মোছা. সুমাইয়া তাসমিন শর্মী (১২৬৯)	১৯.	মো. জিয়ারুল ইসলাম (১৩০২)
৪.	বাসরাত তাসনীম ইরা (১২৭১)	২০.	মো. রেজওয়ান হোসেন রাব্বী (১৩০৪)
৫.	আয়েশা (১২৭৩)	২১.	মো. সজীব মিয়া (১৩০৫)
৬.	মোছা. সানজিদা আরফিন (১২৭৪)	২২.	মনোজ সাহা (১৩০৭)
৭.	মোছা. শেফালী আক্তার (১২৭৫)	২৩.	মো. আহসান হাবীব (১৩০৯)
৮.	সোহানা আক্তার বৃষ্টি (১২৭৬/১৭)	২৪.	মো. নাঈমুল ইসলাম (১৩১০)
৯.	মোছা. মনিরা পারভীন মনি (১২৭৯)	২৫.	মো. সামিউল ইসলাম (১৩১১)
১০.	মোসা. সুমাইয়া আক্তার (১২৮৪)	২৬.	মো. শাহীন খান (১৩১২)
১১.	সিরাজুম মুনিরা (১২৮৫)	২৭.	শেখ সালমান কবীর (১৩১৩)
১২.	মোছা. ফারজানা আক্তার (১২৮৭)	২৮.	মো. আবু শামস শুভ (১৩১৪)
১৩.	মোছা. মারুফা খাতুন (১২৮৮)	২৯.	মো. মেহেরুল ইসলাম (১৩১৫)
১৪.	মোছা. কাকলি খাতুন (১২৮৯)	৩০.	মো. জাকির হোসাইন (১৩১৬)
১৫.	দ্যুতি বিশ্বাস (১২৯০)	৩১.	মো. আরাফাত আমিন (১৩১৭)
১৬.	মো. রাশেদ হাসান (১২৯৭)		

মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৯ ব্যাচের প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন

মেধা লালন প্রকল্প'র আওতায় সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য ২০১৯ ব্যাচের সদস্যদের প্রাথমিক বাছাই পর্ব সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। সর্বমোট ১৪৮ জন আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৬২ জন ছাত্র ও ৬২ জন ছাত্রী প্রাথমিক বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। প্রাথমিক বাছাই পর্বে নির্বাচিতদের মধ্য থেকে মোট ৬০ জন (৩০ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী)-কে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৬ (ছাত্রী)

ক্রমিক	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	আনিসা আজাদ ১২০৫/২০১৬ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	পদার্থ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
২.	শেখ ইফফাত আরা মীম ১২০৬/২০১৬ নাজিরপুর, পিরোজপুর।	বিএসসি (পাস কোর্স) ১ম বর্ষ সরকারি স্বরুপকাঠি কলেজ, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
৩.	প্রত্যাশা সরকার ১২০৮ /২০১৬ ডিমলা, নীলফামারী।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৪.	মোছা. তামিমা খাতুন ১২১১/২০১৬ গুরুদাসপুর, নাটোর।	জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, ১ম বর্ষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৫.	নুসরাত জাহান জ্যোতি ১২১২/২০১৬ চালনা বাজার, দাকোপ, খুলনা।	বিএসসি ইন নার্সিং, ১ম বর্ষ ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।
৬.	মোসা. তৃণা হক ১২১৩/২০১৬ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, নবাবগঞ্জ।
৭.	মোসা. উম্মে জয়নব (শর্মিলা) ১২১৪/২০১৬ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	ভূগোল, ১ম বর্ষ রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী।
৮.	আদুরী রাণী ১২১৫/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	হিসাব বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
৯.	পলি রানী রায় ১২১৬/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফেরী, ১ম বর্ষ নার্সিং ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর।
১০.	মোছা. ফাতেমা আক্তার হীরা ১২১৭/২০১৬ মিঠাপুকুর, রংপুর।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১.	মোছা. কামরুন্নাহার কেয়া ১২১৮/২০১৬ মিঠাপুকুর, রংপুর।	বিএসসি ইন নার্সিং, ১ম বর্ষ রংপুর নার্সিং কলেজ, রংপুর।
১২.	মোছা. সাবিনা ইয়াসমিন ১২১৯/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	বংলা, ১ম বর্ষ করিমউদ্দিন সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট।
১৩.	মোছা. জেমী খাতুন ১২২১/২০১৬ পীরগঞ্জ, রংপুর।	ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর।
১৪.	শাকিলা আক্তার ১২২২/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৫.	মোছা. রুমি খাতুন ১২২৩/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সমাজবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১৬.	হৈমন্তী রানী ১২২৪/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১৭.	মোছা. খাদিজা খাতুন ১২২৫/২০১৬ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সমাজবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর।
১৮.	আতিয়া ফারিহা রাকা ১২২৬/২০১৬ চালনা বাজার, দাকোপ, খুলনা।	ম্যাটস, ৩য় বর্ষ ট্রমা উইমেন্স মেডিকেল এসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল, মিরপুর, ঢাকা।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৬ (ছাত্রী)

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৯.	মোছা. আরফিনা খাতুন ১২২৭ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ সরকারি আলিমুদ্দিন কলেজ, লালমনিরহাট।
২০.	সাদমান সাকিবা (সূচনা) ১২২৯ জামালপুর সদর, জামালপুর।	ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৪র্থ বর্ষ শেরপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, শেরপুর।
২১.	মোছা. শারমীন আক্তার ১২৩১ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	দর্শন, ১ম বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
২২.	মোসা. ঝর্ণা খাতুন ১২৩২ গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রাজশাহী।
২৩.	মোছা. আঞ্জুমা খাতুন ১২৩৪ মিঠাপুকুর, রংপুর।	ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফেরী, ১ম বর্ষ নার্সিং ইন্সটিটিউট, কুড়িগ্রাম।

প্রকল্প সংবাদ

'চিঠিপত্র' শিরোনামে নবীন পত্রিকায় একটি বিভাগ পুনরায় চালু হতে যাচ্ছে

মেধা লালন প্রকল্প'র প্রিয় সদস্যবৃন্দ, তোমাদের সকলকে জানাই শরতের শিশির ভেজা শিউলি ফুলের শুভেচ্ছা!! তোমরা হয়তো জানো যে, মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাদের মেধা লালনের সহায়ক হিসেবে এবং সুপ্তপ্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'নবীন' পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছে। প্রকল্প'র ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে এটির গুরুত্ব এবং সর্বোপারি তোমাদের আগ্রহের বিষয়টি মাথায় রেখে নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থাৎ বছরে চারটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক বিষয়গুলো পত্রিকাটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তবে পত্রিকাটির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে 'অংকুর', যেখানে শুধুমাত্র প্রকল্পের ছাত্রছাত্রীদের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তোমরা যারা সবে লেখালেখি করছ বা ভবিষ্যতে লেখালেখি করতে চাও তাদের জন্য এটা একটা উপযুক্ত প্লাটফর্ম বলে আমরা মনে করি। সুতরাং তোমরা নিঃসংকোচে নবীনে যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠাও আর এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করো।

তোমাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী সংখ্যা থেকে 'চিঠিপত্র' শিরোনামে নবীন পত্রিকায় একটি বিভাগ নতুন করে চালু হচ্ছে। এই বিভাগে তোমাদের মতামত ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। পত্রিকার বর্তমান বা পূর্ববর্তী সংখ্যাটি তোমার কেমন লাগল, এর ভালো দিক মন্দ দিক কিংবা কি করলে পত্রিকাটি আরও ভালো করা যায়–এ সম্পর্কে তোমাদের সুচিন্তিত মতামত এখানে প্রকাশ করা হবে।

নবীন পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করে তুলতে তোমাদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি। তোমাদের লেখা ডাকযোগে আমাদের ঠিকানায় পাঠাতে পারো অথবা hdf.dhaka@gmail.com-এ মেইল করেও পাঠাতে পারো।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

বোতলের তলায় ত্রিকোণ চিহ্ন এর অর্থ কি জানেন?

ঠান্ডা পানীয় থেকে পানির বোতল, কখনও কি লক্ষ করেছেন, এগুলির নিচে থাকে ত্রিকোণ চিহ্ন? হয়তো লক্ষ্য করেছেন কিন্তু সে নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেননি। আজ এই চিহ্নেরই অর্থ জানাব-একবার চোখ বুলিয়ে নিন...

বিভিন্ন প্লাস্টিক বোতলের চারিত্রিক ইনডেক্স জানাতেই এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বোতলটি যে বিধিসম্মতভাবে তৈরি তারই প্রমাণ দেয় এই চিহ্ন। তবে এর মধ্যে থাকা সংখ্যা নির্দেশ দেয় এই বোতলটি কতটা নির্ভরযোগ্য।

ত্রিকোণের মাঝে ১ লেখা–এর অর্থ বোতলটি তৈরির ক্ষেত্রে পলিথিলিন টেরেপথ্যালেট প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, তাই একবারের বেশি এর ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক হতে পারে।

ত্রিকোণের মাঝে ২ লেখা–মূলত সাবান গুঁড়া, শ্যাম্পুর ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘন পলিথিন ব্যবহার করা হয়।

ত্রিকোণের মাঝে ৩ লেখা–এই ধরনের প্ল্যাস্টিকে 'পোলিভিনিল ক্লোরাইড' বা 'পিভিসি'-র ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ধরনের বোতল বেশি ব্যবহারে ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে বলে আশঙ্কা করা হয়।

ত্রিকোণের মাঝে ৪ লেখা–দামি বোতল থেকে প্ল্যাস্টিক প্যাকেটে এই সংখ্যা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন। এর অর্থ আপনি একাধিকবার ব্যবহার করতে পারেন সেটি।

ত্রিকোণের মাঝে ৫ লেখা–খাবারের কন্টেনারে এই সংখ্যা থাকলে বুঝতে হবে তা অনেকবারই ব্যবহার করতে পারবেন এবং তা যথেষ্ট নিরাপদও।

ত্রিকোণের মাঝে ৬ লেখা–এই ধরনের প্লাস্টিক তৈরি হয় পলিস্টিরিন এবং পলিকার্বনেট বিসপেনল-এ। এর থেকে ক্যানসারের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে মত অনেকের। তাই এর ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়।

ত্রিকোণের মাঝে ৭ লেখা–এক্ষেত্রেও তাই। মানব শরীরের হরমোনজনিত সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় বলে মনে করেন অনেকে।

তবে প্লাস্টিকের ওপর চিহ্ন বা সংখ্যা যাই থাকুক, তার অর্থ নিয়ে যতই তর্ক-বিতর্ক থাকুক, এর ব্যবহারের বিষয়ে বেশিরভাগ জনই কিন্তু সতর্কবাণী দিয়ে থাকেন। তাই প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কে আপনিও সতর্ক থাকুন।

আমরা যখন চলতে থাকি তখন চাঁদও আমাদের সাথে চলছে বলে মনে হয় কেন?

পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দুরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কি.মি. (২৩৮৮৬০ মাইল)। চাঁদের ব্যাস প্রায় ৩১৭৬ কি. মি. (২১৬০ মাইল)। এর পৃষ্ঠে বা উপরিতলকে দূরবীনের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। যখন আমরা হেঁটে বা গাড়ীতে করে চলি, তখন চাঁদও আমাদের সাথে সাথে চলছে মনে হয়। অন্যদিকে গাছপালা, ঘর-দোর এবং অন্যান্য স্থির বস্তুসমূহকে মনে হয় পিছন দিকে ছুটে চলছে। এমনটি হবার কারণটি কিন্তু খুব সহজ এবং তা হল পৃথিবী থেকে চাঁদের এই দীর্ঘ দূরত্ব। পৃকৃতপক্ষে পুরো ব্যাপারটাই হল মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটিত। যখন আমরা গাড়িতে করে চলি তখন পৃথিবী-উপরিস্থিত কোন বস্তু আমাদের চোখে যেন কোণ উৎপাদন করে তার দ্রুত

পরিবর্তন ঘটে। এমতাবস্থায় বস্তুসমূহকে আমরা পিছন দিকে ছুটে চলতে দেখি। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ এসব বস্তু আমাদের থেকে বেশি দূরে নয় বলে আমাদের চলার সাথে সাথে উপরোক্ত কোণের ঐ রকম দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সে তুলনায় চাঁদ আছে আমাদের থেকে অনেক দূরে। এক্ষত্রে চাঁদ আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে, আমাদের চলার সময় তার পরিবর্তন হয় অতি ক্ষীণ। এমনকি, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে যদি আমরা কয়েক মাইলও পরিভ্রমণ করি তবুও কোণের এই পরিবর্তন উপলব্ধি হবে না। দূরে আছে বলেই এই কোণের পরিবর্তণ এ ক্ষীণ হয়। আর এই জন্যই আমরা যখন আমরা যখন চলতে থাকি তখন চাঁদও আমাদের সাথে চলছে বলে মনে হয়।